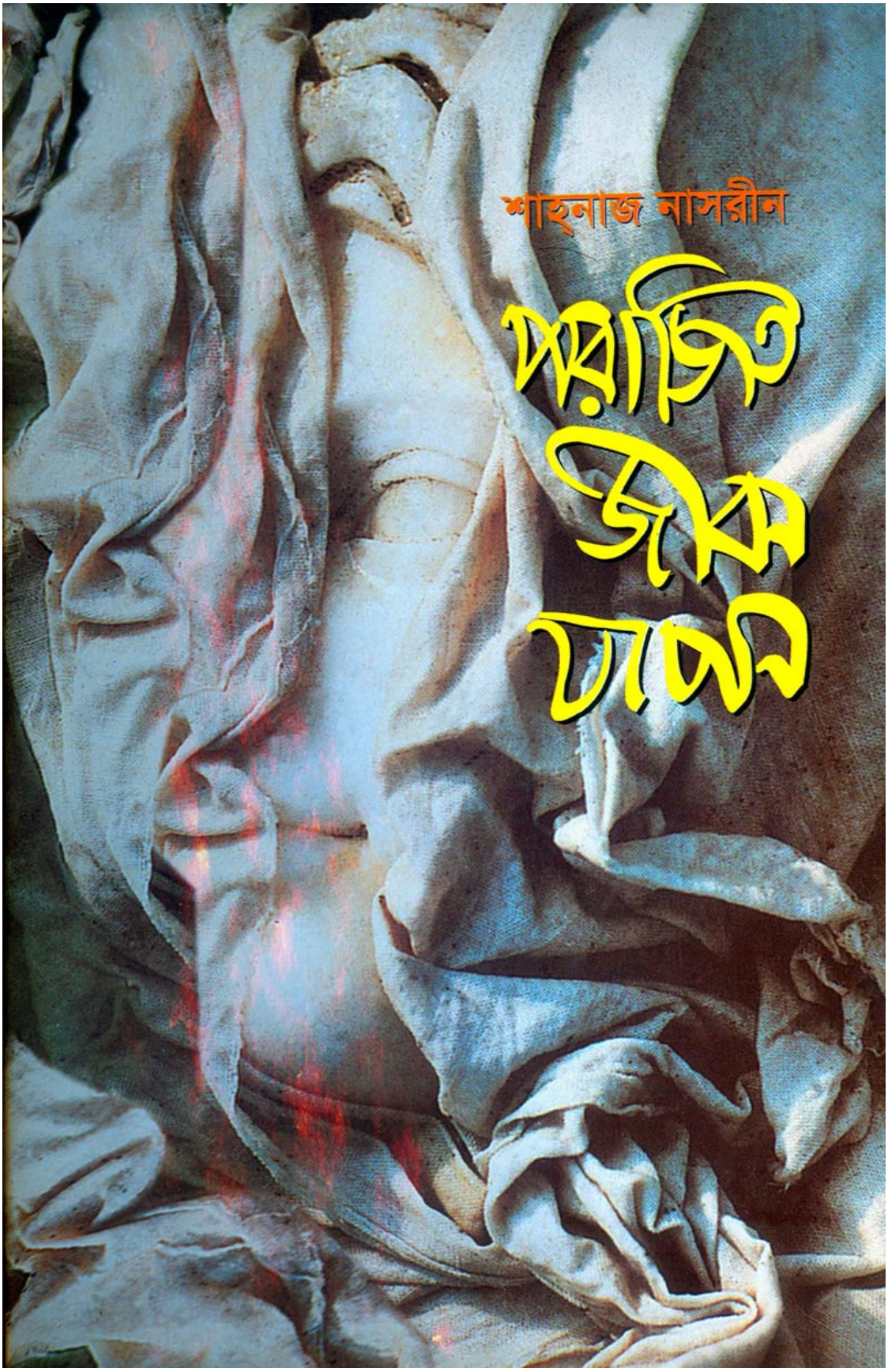
শাহনাজ নাসরীন
পরাজিত জীবন

# পরাজিত জীবন যাপন

শাহনাজ নাসরীন

প্রকাশকাল : ঢাকা বই মেলা, ২০০৩
স্বত্ত্ব : লেখক
প্রকাশক : গ্রন্থকানন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল
মূল্য ৭০ টাকা
ISBN 984-8230-88-4

উৎসর্গ : রফি, শিক্ষক
ও
বন্ধু

**গল্পক্রম**

পরাজিত জীবন যাপন
আশরফী লজ
বন্দী
ভালবাসার গল্প
হৃদয়ে কারাগার
বিবমিষার গল্প
প্রাপ্তি
রত্নগর্ভা
তিন বন্ধুর এক সন্ধ্যা
অপনোদন

# আশরফী লজ

পুরো এলাকাটা পরিণত হয়েছে  আলোক কুন্ডে। অনেক দূর থেকে চোখ যায় এই আলোর বন্যায়। আলোর বিস্তৃতি, বিচ্ছুরণ, উজ্জ্বলতা নকশা সব অভিনব মনে হয় এখানের মানুষের কাছে।

ছোট্ট জেলা শহরের আরও ছোট্ট টাউনটি সন্ধ্যার পর পর অন্ধকার হয়ে যেতেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন এর বিশাল অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছে এক সুরম্য প্রাসাদ। নাম 'আশরফী লজ'। এক সময়ের শীর্ষ সন্ত্রাসী 'সদু ওরফে শহীদুলের' মায়ের নামে বাড়ির নাম। তার মায়ের নাম অবশ্য সোনাভান। সে তাই বাড়ির নাম ঠিক করেছিল 'সোনাভান ভিলা। পরে বাড়ির ডিজাইন করেছে যে ইঞ্জিনিয়ার সে বললো 'স্যার তারচে স্বর্ণ ভিলা বা সোনালী ভিলা রাখলে কেমন হয়?  মায়ের নামটাও থাকবে আবার বাড়িটারও একটা সুন্দর কাব্যিক নাম হবে।'

ইঞ্জিনিয়ারের কথা তার পছন্দ হয়েছিল। খুবই কাজের লোক। তবু সে তার গুরু, সব বিষয়ে পরামর্শদাতা রজব ভাইয়ের সংগে আলাপ করেছিল। তিনিই এই নামটা ঠিক করে দিয়েছেন। বললেন,'স্বর্ন, সোনালী এগুলিতে কেমন একটা হিন্দুয়ানী গন্ধ আছে। আশরফী অর্থও তো স্বর্ণই; স্বর্ণের মোহর। আশরফী লজ্ রাখ। বনেদী নাম হবে।'

শোনা যায় অনেক অলিগলি চোরাপথ আছে এ বাড়িতে। এই নিস্তরঙ্গ শহরের ততোধিক নিস্তরঙ্গ মানুষের জীবনে এই বাড়ি এক রকমের ভয়মিশ্রিত বৈচিত্রের জন্ম দিয়েছে। সব মিলিয়ে এ বাড়ি তাদের চোখ টানে, মন টানে। তারা ভয়ে ভয়ে এর জৌলুস দেখে, নিরাপত্তা দেখে আর গল্প বানায়।

আজ আশরফী লজে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সদু ইলেকশানে জিতেছে। সদু তার প্রাসাদের মত বাড়ির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাটে আর মুগ্ধ হয়ে দেখে এখনও কত লোক আসা যাওয়া করছে। পুরো শহরই দাওয়াত করে ফেলেছে সে।

বিকালে তার নামে মিলাদ পড়ানো হয়েছে। এখন তার নাম মোঃ শহীদুল্লাহ্ চৌধুরী। বুদ্ধিটা অবশ্য রজব ভাই দিয়েছেন। নামের সাথে এরকম একটা কিছু না থাকলে কেমন পানশে লাগে। এখন সে কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি। কত জায়গায় যাবে, পত্র-পত্রিকায় নাম লেখা হবে। এখন আগের মত সদু বা শহীদুল বললে কেমন দেখায়!

হুজুর ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে ঠিকমত। নামটা কাগজে লিখে দেয়ার সাথে সাথেই ধরে ফেলেছে কোন বিষয়ে জোর দিতে হবে। মোনাজাতের সময় এত বার চৌধুরী সাহেব বলেছে যে সবার মুখস্ত হয়ে যাবে। সে ভেবেছিল লোকজনকে চৌধুরী সাহেব বলানোটা অভ্যাস করাতে হবে। কিন্তু হুজুর খুব ভালভাবে করেছে কাজটা; তার নিজেরই মনে হচ্ছে না যে, তার নামের সাথে চৌধুরী ছিল না কখনো ।

যাক্, হুজুর তাকে খুশী করেছে। সেও খুশী হয়ে পাঁচ হাজার টাকা বেশী দিয়ে দিয়েছে। সে ঠিক করলো কয়েকদিনের মধ্যেই তার জন্মদিনের কথা বলে এলাকার দশ বার জন হুজুরকে দাওয়াত করবে খতম পড়াতে। উপহার হিসেবে প্রত্যেককে একসেট পাজামা পাঞ্জাবী টুপি দেবে। আর এখন শীতকাল যখন, একটা করে সালও দেয়া যায়, খুশী হবে খুব। আপদে বিপদে এরাই কাজে লাগে বেশী।

সদু আস্তে আস্তে ছাদে উঠে। সেখানে একটা প্রচন্ড সুন্দর ঘর বানিয়েছে সে। এখানে কারও, ঢোকার অনুমতি নেই। একটি বিশেষ বেল আছে প্রয়োজনে সেটা বাজালে তার অতি অনুগত সাগরেদটি উঠে এসে তার ফুট ফরমাস খাটে। এখন তার পান করতে ইচ্ছে করছে। এত আনন্দ সেলিব্রেট করা দরকার। পান না করলে কোন কিছুতেই পূর্ণতা আসে না।

পান করতে করতে হঠাৎ কান্না পায় ওর। এই সাফল্য এই বিশাল রাজত্বের মধ্যেও ব্যার্থতার কথা মনে পরে বুকের মধ্যে খামচি লাগে। ঋতুর কথা মনে পড়ে। মাগীকে কিছুতেই ম্যানেজ করা গেল না। সে তবুও ছাড়তো নাকি। কিন্তু সময়টাই বোধহয় ছিল হাড়ানোর। তাই মাগী বেঁচে গেল। তখন হঠাৎ করেই ব্যবসায় উপরে উঠার সিড়ি পেয়ে গেল।

তবুও কি সে ছাড়তো নাকি। না ছাড়তো না। সে সুতায় প্যাঁচ দিতে আরম্ভ করেছিল ঠিকই। কিন্তু এর মধ্যেই মা বোধহয় টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই পাত্রী খুঁজে সময় নষ্ট না করে হঠাৎ করেই খালাতো বোন জুলির সংগে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললো। ওদিকে টাকা হওয়ার সংগে সংগে সেও দলে ক্ষমতা পেয়ে গেল। তারপরতো শুধুই ব্যস্ততা আর ব্যস্ততা। ধান্দাবাজি করতে করতে দুটি ছেলের বাবা হয়ে গেল। আর এই ব্যস্ততার মধ্যে মাগী চম্পট দিলো বিদেশে।

তার স্ত্রীর বড় অবদান এই সংসারে। সে-ইতো সব সামলাচ্ছে। আহারে বেচারীর দিকে নজরই দেয়া হয় না। সদু ঠিক করে ফেললো, কালই তার স্ত্রীর জন্য একসেট হীরা বসানো গয়না নিয়ে আসবে।

আবার ঋতুর কথা মনে পড়ে রাগ চড়তে থাকে তার। সে যেখানে হাত দিয়েছে সেখানেই সফল হয়েছে শুধু.....। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে স্থির চোখে সামনের শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। দৃশ্যগুলি যেন দেয়ালের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। ঋতু বয়সে দেবীকার ছোট ছিল তবে ওর সাথে মাখামাখি করতো খুব। প্রায়ই রাস্তায় হাঁটতো একসাথে। সে সময় শহীদুল ঘন ঘন রাস্তা ক্রস করতো আর বন্ধুবান্ধব সাথে থাকলে টিজ করতো। একদিন ঋতু হঠাৎ দাড়িয়ে গিয়ে ইচ্ছামত অপমান করেছিল। সদু কিছু বলতে পারেনি হঠাৎ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সে নিজেই তখন কুঁচো আর ঋতুর দাদার তখন বেশ প্রতিপত্তি ছিল এলাকায়।

এভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্লাসটা দেয়ালে ছুড়ে মারে সে, সগতোক্তি করে ....শালী.....এখনও নাকি বিয়া বয় নাই ..... ওহ্ একবার পাইলে..... ওহ্ ..... তার প্রচন্ড অস্থির লাগে। এসি রুমেও দরদর করে ঘামছে। টান মেরে পাঞ্জাবীটা খুলতে চেষ্টা করে কিন্তু সিল্কের পাঞ্জাবী ঘামে ভিজে লেপটে গেছে শরীরে, অত সহযে খোলে না। অধৈর্য্য হাতের টানা হেঁচড়ায় ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সে টুকরোগুলি ছড়িয়ে দিয়ে হাসে। যাও যাও কত পাঞ্জাবী যাবে আসবে।

ইচ্ছে করছে সব কিছু ছিড়ে ফেড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিতে। সামনের টেবিলটাকে হঠাৎ প্রচন্ড জোরে লাথি মারে। মনে হয় যেন লাথিটা মেরেছে ঋতুর তলপেটে। টেবিলটা ছিটকে পড়ে বিকট শব্দ হয়। সে কিছুক্ষন চুপচাপ বসে থাকে দরজার দিকে তাকিয়ে। নাহ্ কেউ কোথাও নেই। সে দুলে দুলে হাসতে থাকে। হ্যাঁ, দিস ইজ পাওয়ার। সে জানে যতক্ষণ যাদুর বাঁশি না বাজবে সব এ রকম সুনসানই থাকবে। আর বেল দেয়ার সংগে সংগে গলা বাড়াবে কানা বদর। ঠিক যেভাবে হুকুম দেয়া আছে সেভাবেই সব ঘটবে । সে আবার টেনে টেনে বিড় বিড় করে হু.. বা..বা. দিস ইজ পা-ও-য়া-র।

সে পাজামাটাও খুলে ফেলে এবার। নাহ্ আজ মেয়েমানুষ না হলে চলবে না। যদিও বাড়িতে সে মেয়ে মানুষ আনে না, অন্য জায়গায় ব্যাবস্থা করা থাকে। কিন্তু এখন আর বের হতে পারবে না। তাছাড়া আজ কোন প্রস্তুতিও রাখা হয়নি। ওরকম পরিকল্পনা ছিল না বলে। ঠিক করেছিল আজকের দিনটা পরিবারের সংগেই কাটাবে কিন্তু..... শালী..... কি করা যায় ভাবতে ভাবতে নোটনের কথা মনে হলো তার। একবার মনে হলো পাড়ার মেয়ে বদনাম হবে। তারপরেই হাসলো কিসের বদনাম কেউ জানবেই না।

ওরা ছোট থেকেই নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই এত ভীত আর বিব্রত থাকে যে সবরকম অন্যায়, উৎপীড়ন, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস করে নিয়েছে। প্রতিবাদ দূরে থাক অধিকারের কথাও ভাবেনা। ছেলে বুড়ো সবাইকে সব সময় তেল দিয়ে কথা বলে খুশী রাখার চেষ্টা করে। আর জানলেও কি অনেকে বরং খুশীই হবে।

আজ সকালে দেবীকা আর নোটন এসেছিল। ওদের সবার ছোট ভাই গৌরাঙ্গ একটা ছোট্ট মুদী দোকান চালায়। পাড়ার কয়েকটা ছেলে নাকি ওখানে গিয়ে চাঁদা চেয়ে এসেছে। আবার ওর ভাইকে ভয়ও দেখিয়েছে চাঁদা না দিলে জানে মারবে আর দোকানও উঠিয়ে দেবে। হাসি পায় শহীদুল্লার ঐ দোকানে মাসে দুই হাজার টাকা আয় হয় কি না সন্দেহ। মালপত্রই কেনার সামর্থ্য নাই ওখান থেকে কি চাঁদা দেবে।

দেবীকা অনুরোধ করছিল ওদের সামনেই ডেকে বলে দেয়ার জন্য। ও আজকে বাসায় থাকবেনা অন্য শহরে চলে যাবে নাটক করতে। আসতে চার-পাঁচদিন দেরী হবে। বাসায় নোটন, গৌরাঙ্গ আর মা একা থাকবে। ওরা ভয় পাচ্ছে খুব। দেবীকা বলেছিলো, 'দাদা আপনে এখন এলাকার মাথা আপনে যদি একবার বলে দেন ওরা আর কখনই ঝামেলা করবে না।'

শহীদুল চিনতে পেরেছে ছেলেগুলোকে মইজ্জা, সাগর আর কামাল। একেবারেই কুঁচোকাচা। তবে সে ব্যাপারে কিছু না বলে হাসতে হাসতে বলেছে, 'সেইটা নাইলে হইলো কিন্তু আমি তোদের দুঃখ দেখুম ক্যান তোরা কি আমারে ভোট দিছিস তোরা তো ভোট দেস অন্য পার্টিরে ?'

ওর কথায় দুবোনই প্রচন্ড চমকে উঠে। তারপর সামলে নিয়ে দেবীকা বলে, 'আপনে কি কন দাদা আমাদের আবার দল কি। আমরা চিনি আপনেরে। আপনেরে ভোট না দিয়া কোন দলেরে ভোট দিমু !'

শহীদুল কিছু না বলে হাসতে থাকলে দু বোন আরও ঘাবড়ে যায়। বলে, 'এখন আর আপনেরে বিশবাস করানের উপায় তো নাই। কিন্তু আপনে যে এমন ভাববেন এইটাও ভাবি নাই।'

এভাবেই বিভিন্ন আবোল তাবোল কথা বলে তারা প্রাণপণে চেষ্টা করে শহীদুলের আস্থা অর্জনের। কিন্তু শহীদুল সরাসরি কিছু না বলে শুধু বলে, 'ঠিক আছে এখন যা, আজকে বাড়িতে অনেক ঝামেলা। এখন এত ব্যস্ততার মধ্যে আর লোক ডাকাডাকি করতে পারব না। অনুষ্ঠানে তো ওরা থাকবই, শেষ হোক তারপর ডাকব। তোরাও আসিস এখন বাড়ি যা।'

শহীদুল ঘড়ি দেখে। মাত্র বারটা, এসময় ডাক দেয়াই যায়। বেল বাজায় সে।

ঠুক ঠুক শব্দে ঘরের তিনটি প্রানীরই ঘুম ভেঙ্গে যায়। যে বাইরে দাড়ানো সে অন্য কোন শব্দ করছে না বিরতিহীনভাবে ধাক্কাই দিচ্ছে তবে খুব জোরেও না। তিনজনই নিঃশব্দে উঠে বসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। তারাও কোন শব্দ করেনা। নিঃশবাস প্রায় বন্ধ করে বসে থাকে। কিন্তু বুঝতে পারে এভাবে বেশিক্ষণ

বসে থাকা যাবে না। ধাক্কা ক্রমাগত বাড়ছে। নোটন ভয়ে আধমরা হয়ে যায়, আজ দিদির সাথে সে-ই শহীদুলের ওখানে গিয়েছিল তারই প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়। ওরা এখন প্রতিশোধ নিতে এসেছে নালিশ দেয়ায়।

এখন দরজাটায় খুব জোরে জোরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। একেকবারের ঝাকানিতে টিনের বাড়ি পুরোটাই নড়ে উঠছে। এমনিতেই পুরোনো নড়বড়ে বাড়ি। আর কিছুক্ষণ ধাক্কা লাগলে হয়তো ভেঙেই পড়বে।

ওদের মা উঠে দাঁড়ায়। ওরা ধরে রাখতে গেলে ইশারায় বলে চুপচাপ বসে থাকতে। তারপর পায়খানায় ঢুকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখ রাখে বাইরে। বিভিন্নভাবে কসরত করতে থাকে কে দেখার জন্য। বাইরে জমাট মানুষ নাই দেখে একটু ভরসা লাগে তাঁর। পায়খানা থেকে বের হয়ে দরজার কাছে দাড়িয়ে খুব আস্তে বলেন, 'কে গো বাবা' ?

কানা বদর নিজের কোন পরিচয় দেয় না। শুধু বলে, 'নোটনরে স্যার যাইতে বলছেন। উনি সকালে থাকবেন না এখনই কথা সারবেন।'

এতক্ষণ পর নোটনের বোধ ফিরে আসে মনে হয় সে বেঁচে আছে। তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলে। বদরকে সে এমনিতে খুব ভয় পায়। তবু এখন আপনজনের মত জিজ্ঞেস করে, 'এখন এতো রাত হয়া গেছে কালকে ভোরে গেলে হয় না ?'

'হইলে তো কালকেই ডাকতো । উনি ভোররাইতে রওনা দিবেন'।

নোটনের আর সাহস হয় না কিছু বলতে। মা হাত চেপে ধরেছে। সে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অভয়ের হাসি হাসে, 'ঐ ব্যাপারে কথা বলতে ডাকছে মনে হয় বেশি দেরী হইবনা।'

তারপর কানা বদরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না বদর দা ?'

কানা বদর জবাব দেয় না। এতক্ষন হাতের মধ্যে লোফালুফি করতে থাকা লাঠিটা এক চোখে গভীর মনযোগে দেখতে থাকে।

নোটন প্রচন্ড ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগুতে থাকে। কি ঘটতে পারে সে আগাম ভাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সবই তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। সে আবার নতুন করে ভাবনা শুরু করে। নিজেই নিজেকে বলে, 'আমার মনে হয় মাস্তানগো লগে কথা বইলা উনি ওগোরে শাসাইয়া দিছেন সেইটাই জানাবেন। এমনও হইতে পারে ওগোরেও ডাকছেন, এখনই ফয়সালা হবে। কিন্তু এতো রাত্রে..... কি জানি মানুষ কত রকম বলে..... অবশ্য আমাগো সাথে..... নাহ.....উনিরে ছোট থাইকাই আমরা দাদা বলি.... না ..না.. ছি..ছি.. ইস্ দেবীদি থাকলে ভাল হইত..... উনি কি জিজ্ঞাসা করবেন কে জানে....ও কথা গুছাইয়া বলতে পারে....আমি আবার কী বলতে কি বলি।'

ভয়ে তার মাথা আবার এলোমেলো হয়ে যায়। আর অন্যমনস্কভাবে ঢুকতে গিয়ে গেটে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

কানা বদর একটু এগিয়ে গিয়েছিল শব্দ শুনে ছুটে এসে হ্যাঁচকা টানে দাড় করিয়ে দেয়। তার সাংঘাতিক মেজাজ খারাপ হয়েছে। মনে হয় মিচকা শয়তান মেয়েটা ইচ্ছে করেই এখানে ঘটনাটা ঘটিয়েছে। সে তার ভালো চোখটা দিয়ে নোটনকে প্রায় ঝলসে দিতে থাকে।

নোটন কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করলে সে তর্জনীটা ঠোঁটের উপর রেখে হিস হিস করে ওঠে....'চোপ্', তারপর চলতে শুরু করে। উপরে উঠে সে নিজের মোড়াটায় বসে। নোটন দাড়িয়ে গেছে দেখে শহীদুলের ঘরের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলে, 'যা'।

নোটন আবারও একটু থমকে যায়। ইচ্ছে করে ফিরে যেতে। তারপর সামনের দিকে এগুতে থাকে। পরদা সরিয়ে শুধুমাত্র আন্ডারওয়ার পরা শহীদুলকে দেখে নোটন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

শহীদুল নোটনের বিমুঢ় অবস্থা দেখে মুচকি হেসে পান করতে থাকে। একটু পরে বলে, 'কিরে মূর্তি হয়া গেলি যে ভিতরে আয়।' ও নড়াচড়া করছে না দেখে আবার হাসে, 'আয়, এদিকে বস'।

তবু নোটন নড়ছে না দেখে নিজেই এগিয়ে একটা হাত ঘাড়ের উপর দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ওকে ভিতরের দিকে টানতে থাকে। নোটন কেঁদে উঠে দাদা.....। শহীদুল হাতের চাপ শক্ত করে কঠিনভাবে বলে, ´কোন নাটক না। কে দাদা ? তোগো দেশে গিয়া দাদাদের ধরিস।´

চারটার সময় শহীদুল বাথরুম থেকে ফিটফাট হয়ে বের হয়ে দেখে তখনও নোটন ঝিম মেরে বসে আছে। তার বিরক্ত লাগে তবু মেজাজ খারাপ না করে রসিকতা করে বলে, 'কি তৈরী হ, নাকি যাইতে ইচ্ছা করে না ?'

নোটন নড়াচড়া করছে না দেখে আবার হাসতে হাসতে তাড়া দেয়, 'নে তাড়াতাড়ি ওঠ, এখন আর চাইলেও সময় দিতে পারব না। অনেক কাজ।'

এই অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতায় আস্তে আস্তে নোটনের সম্বিৎ ফিরে আসে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে তীব্রভাবে তাকিয়ে থাকে।

শহীদুল আবারও হাসে। 'এত আদর করলাম তবুও রাগ। এখনও তো বড় বোন বিয়ার বাকী। জীবন যৌবন শুকাইয়া কি লাভ। নে ওঠ্ আর সময় নাই।'
নোটন উঠে শাড়ীটা জড়িয়ে পা বাড়ায়। শহীদুল হঠাৎ ডাক দিয়ে কিছু টাকা ওর হাতে ধরিয়ে দেয়, 'নে রাখ। আর তোর ভাইয়ের কথা আমি বলে দিব ঐটা নিয়া চিন্তা করিস না।'

নোটনের কি যে হয় হঠাৎ সে টাকাটা ছুড়ে মেরে থুতু ছিটিয়ে দেয় শহীদুলের মুখে।

শহীদুল হতভম্ব হয়ে প্রচন্ড জোরে চড় মারে ওকে। তারপর বদরকে ডেকে বলে, 'মইজ্জারা আছেনা ? ওরে নিয়া যাইতে বল।'

তারপর নিজের গোপন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'কুত্তার পেটে ঘি সয় না।'

সারাদেশে নোটনের গণধর্ষণের ঘটনা যথেষ্ট আলোড়ন তুললেও  আসামীরা ধরা পরে না এবং শহীদুল্লাহ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ পায় না। সাংবাদিকরা এলাকার অভিভাবক হিসেবে শহীদুল্লাহ্ চৌধুরীর বিবৃতি ছাপে। সেখানে তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দা জানান এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দেন যে অপরাধীরা যেখানেই থাকুক তাদেরকে ধরা পড়তেই হবে এবং আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিভোগ করতে হবে।

শুধু শহীদুল্লার নির্দেশে কানা বদর পরিবারটিকে ছায়ার মত অনুসরণ করে।

# প্রাপ্তি

হাসপাতালের করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করে সমেদ আলীর। হাতে একটা বালিশ। তার ইচ্ছে করছে বালিশটাকে মাটিতে ফেলে ইচ্ছেমত পাড়ায়। পাড়িয়ে পাড়িয়ে ভেতর থেকে সব বের করে নিয়ে আসে। বালিশটা আনার কোন দরকারই ছিল না। অ্যাম্বুলেন্সে জোবেদাকে শোয়ানোর পর স্যলাইনের সুঁইটা টান খেয়ে আছে দেখে তার শালী মাসুমা দৌড়ে ভিতর থেকে বালিশ এনে হাতের নীচে দিয়ে দিয়েছে। এখন এটা হাতে হাতে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। হাসপাতালে রেখে আসতে পারতো, কিন্তু পরে আর ফেরত পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

সমেদ আলী মুখ কুঁচকে থু করে থুথু ফেলল। মুখটা তিতা হয়ে আছে। আবার থুথু ফেলে সে। নিজে নিজে গালাগালি করে 'হারামজাদী মাইয়া বিয়াইছে আবার। কত ঢং যে করলো। সারারাইত কোঁতাইয়া সকালবেলা মাইয়া বিয়ানের লাইগ্যা আনন লাগল হাসপাতালে।'

তাও সে আনতো নাকি ওই মিচকা শয়তান বোনটা..... 'কান্দাকাটি কইরা আশে পাশে হূলস্থুল ফালাইয়া দিলো, সবাই মিল্যা গাড়ীর তোড়জোড়.....অহন তো কোন দরদীর খবরও নাই।''

সে হাঁটতে শুরু করে। এখন তার আর এখানে থাকার দরকার নাই। দাইটাকে বলেছে কাছে থাকতে। ডাক্তারের সংগে কথা হয়েছে। কালই রিলিজ করে দেবে। সে অবশ্য আজই নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই রাজী হলোনা। বললো তিনদিন থাকতেই হবে শরীরের অবস্থা ভালো না। অনেক বলে কয়ে সে কালকের জন্য বন্ড নিয়ে রিলিজ করতে রাজী করিয়েছে। সে মনে মনে বলে 'হুহ্ অবস্থা ভালো না যত ফালতু কথা। মেয়েলোকের জান হইতেছে দুনিয়ায় সবচে শক্ত জিনিস।'

তার ইচ্ছা করছে সব ভেঙেচুরে ফেলতে। জান্তব একটা রাগ ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। এটাকে কোথায় কিভাবে ঢালবে খুঁজে পাচ্ছেনা সে। তার কপালটাই খারাপ দুইটা মেয়ের পর যাও একটা ছেলে হয়েছিল তিন মাসের মাথায়ই মারা গেল। এবার আশা করেছিল ছেলে হবে। হুজুরের কাছ থেকে ছেলে হওয়ার তাবিজ নিয়েছিল, তিন মাস পানিপড়া খাওয়ানো হয়েছে, সবাই লক্ষণ বিচার করে বললোও ছেলেই হবে, এমন কি ব্যাথা উঠার পর নমুনা দেখে দাইটা পর্যন্ত বললো ছেলের ব্যথা। সে জন্যেই না সে আরও..... আসলে তার কপালটাই খারাপ না হলে এমন বেজন্মার ঘরে সম্বন্ধ হয়।

শ্বশুরটা একটা হারামী। তারা বিয়ের সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছিল আর বলেছিল 'আপনেগো মাইয়া গহনাগাটি ঘর সাজানী যা দিবেন মাইয়ারই হইল'। তার শ্বশুর টাকা দিয়েছে তিরিশ হাজার, মেয়েকে হালকা তিনপদ গহনা দিয়েছে। ফার্নিচার বলতে দিয়েছে খাট, আলমারী, ড্রেসিং টেবিল আর আলনা। ডাইনিং টেবিল, সোফাসেট, টেলিভিশন, ফ্রিজ কিচ্ছুনা। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে 'দরকার আছিলো তখনই লাথি মাইরা বিদায় দেওন।'

মাসুমা নাজিয়াকে নিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটু একটু ভয় লাগছে। আপার শরীরটা এবার একদম ভালোনা। ঘন ঘন তিনটা বাচ্চা হয়ে শরীর এমনিতেই ভেঙে পরেছে, তার উপর কোলের বাচ্চাটার মৃত্যুশোক। হাসপাতালে যাওয়ার সময় আপা ভীষণ কাঁদছিলো।

দূর থেকে দুলাভাইকে আসতে দেখে সে একটু এগিয়ে দাঁড়ায়। নাজিয়া ভিতরের দিকে দৌড় দেয় । বাচ্চাগুলি বাবাকে যমের মত ভয় পায়। এত ছোট বাচ্চা তবু অনাদরটা ঠিকই বোঝে।

দুলাভাইয়ের কালো মুখের দিকে তাকিয়ে মাসুমার বুক কেঁপে ওঠে। তবু এগিয়ে গিয়ে বালিশটা নেয়ার জন্য হাত বাড়ায়। সমেদ আলী অপ্রয়োজনীয় একটা ঝাড়া দিয়ে বালিশটা মাসুমার হাতে ফেলে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে,' তোমার ভাগ্নী হইছে। কালকেরতে তো বহুত কান্দাকাটি করলা। অহন সুখবরটা পাড়ায় পাড়ায় দিয়া আসো। খালি হাতে যাইতে পারবা, না মিষ্টি আনন লাগব ?'

সমেদ আলীর অভিব্যক্তির অস্বাভাবিক রূঢ়তায় মাসুমা হতবাক হয়ে যায়। কোন জবাব দেয় না। এ বাড়িতে কখনই আসতে চায়না সে। কিন্তু বাবার অসুখ দেখে মা তাকে জোর করে পাঠিয়েছে। আর না এসেই বা কি করতো। আপার ছোট দুটি বাচ্চা তার উপর এই শরীর।
সে বালিশটা রেখে রান্নাঘরে ঢোকে দুলাভাইকে নাস্তা দেয়ার জন্য। এ বাড়িতে কোন কাজের লোক নেই। সকাল থেকে সব কাজ করতে করতে সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। আপা কিভাবে সব সামলায় ভাবতে গিয়ে তার বুক ফেটে কান্না আসে। কত হবে এখন আপার বয়স সম্ভবত বাইশ -ষোল বছরে বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে চারটি বাচ্চা হয়েছে ।
সমেদ আলীকে নাস্তা দিয়ে মাসুমা আবার রান্নাঘরে যায়। দুপুরের রান্না করতে হবে। সকাল থেকে টেনশন, কাজ সব মিলিয়ে তারও নাস্তা খাওয়া হয়নি । একটু আগেও প্রচন্ড ক্ষিধে পাচ্ছিল। কিন্তু এখন দুলাভাইয়ের বিকৃত রূঢ়তার পর তার উল্টো বমি বমি লাগছে।
এই পরিবারটিকে সে মনে প্রাণে অপছন্দ করে। বিয়ের পর সে আপার সংগে একবার ওর শৰশুবাড়িতে গিয়েছিল। তার বয়স তখন বার কি তের হবে । এক সপ্তাহ ছিল সেখানে। বিস্ময়ে ভয়ে সে একেবারে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। আপার শৰশুর লোকটা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে কারও না কারও দোষ ধরছেই। আর গালাগাল... বাড়ির কামলা থেকে শুরু করে আপার শাশুড়ী পর্যন্ত কি কুৎসিত গালাগাল! আপার শাশুড়ী আর ননদ তিনটি ভয়ে মুখ শুকিয়ে সারাক্ষণ কাজ করে যেতো, কখনও কাঁদতো। সারদিন কি অশান্তিই না লেগে থাকতো বাড়িটায়। নতুন একটা বউ গিয়েছে বাড়িতে, অথচ পুরো পরিবারে ছিল না কোন আনন্দ উচ্ছাস বা আয়োজন। এমন নয় যে ওদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। বরং তাদের চেয়ে কিছুটা ভালই হবে। অথচ কি দীনতা তাদের চলাফেরায়। নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি সম্মানবোধের কি অভাব!
এবার আপার বাসায় এসে সে যেন সেই একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি দেখছে। অথচ দুলাভাই লেখাপড়া শিখেছে। স্যাটেলমেন্ট অফিসে চাকরি করে। মাসুমার মনে হয় তার সৌখীন আপাও আস্তে আস্তে তার শাশুড়ীর মত নিস্পৃহ বিষাদগ্রস্থ আর নাজিয়া, নাবিলা আপার ননদদের মত ভীতু আর যান্ত্রিক হয়ে উঠবে।

বাচ্চাটা কাঁদছে, দুধ দেয়া দরকার। অথচ জোবেদার একেবারে ইচ্ছা করছেনা নড়াচড়া করতে। শরীরটা এত দুর্বল যে কোন সাড়া পাচ্ছেনা। সে আস্তে আস্তে ঘুরে বাচ্চাটার দিকে তাকায়। কান্না পায় তার। ফিসফিস করে বলে 'মাইয়া হইয়া জন্মাইলি নিজে তো আদর পাবিই না বড় দুইটার কষ্ট আরও বাড়াবি।'
স্তন ভরে এসেছে দুধে। দুর্বল বাচ্চাটা টেনে শেষ করতে পারছেনা। দুধ গড়িয়ে পড়ছে। সেইসাথে জোবেদার চোখ থেকেও জল গড়াতে থাকে। আজই ওকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। কি নোংরা হাসপাতাল। হঠাৎ হঠাৎ ছাগল ঢুকে তারস্বরে ম্যা ম্যা করে চেঁচাতে থাকে। কুকুর ঢুকে বেডের নীচের পরিত্যক্ত জিনিসগুলো চাটে, বেডের পাশে রূগীদের খাবার আর অষুধপত্র রাখার যে তাক সেখানে বিড়াল উঠে বসে থাকে। তবু জোবেদার এক মুহূর্ত ঐ দুঃসহ ঘরের কথা মনে পড়ে ইচ্ছে হয়, আরও কটা দিন এখানেই থেকে যেতে।
দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে একসময় চোখ লেগে আসে ওর। হঠাৎ টের পায় দাইটা ঠেলছে। জোবেদা ক্লান্তিতে চোখ টেনে খুলতে পারে না। বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করে। শুনতে পায় দাইটা বলছে, 'অনেক ধকল গেছে তো, শইল অহনও দুর্বল।'
দাইটা আবার তাকে ডাকে 'ওডেন গো আম্মা, আফনেরে নিতে আইছে।'
জোবেদার মনে পড়ে ফিরে যাওয়ার কথা। সে তাড়াতাড়ি চোখ খুলেই দেখতে পায় সমেদ আলীর ক্রোধ আর বিরক্তিতে কুঁচকে যাওয়া বিকৃত মুখ। জিজ্ঞেস করে, 'কখন আসলা'?
সমেদ আলী সে কথার জবাব দেয় না। তীব্র শ্লেষে জিজ্ঞেস করে,' ঘুম পুরছে ? অহন যাইতে পারবা না পরে যাইবা'?
জোবেদা একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, 'সব ব্যবস্থা হইছে'?

‘হ ব্যবস্থা আর কি, রিক্সা আনলেই যাওন যায়, না কি গাড়ি লাগব ?’
জোবেদা কিছু বলে না। মাথা নীচু করে কান্না সামলানোর চেষ্টা করে। এই নিষ্ঠুর লোকটিকে সে চোখের পানি দেখাতে চায় না।

মাসুমা ঘর গোছাতে গোছাতে রান্নার কথা ভাবে। বাজার কিছুই নেই। সে বাজারের কথা বলার কোন সুযোগই পায়নি। দুলাভাই নাস্তা সেরেই বের হয়ে গেছে কিছু না বলে। তার বিরক্ত লাগে। এই একটা চিন্তা সারাক্ষণই করতে হয়। দুলাভাইয়ের যে খুব অভাব তা না। কিন্তু সে তার মর্জিমত একটু একটু করে বাজার করে। ফলে মাসুমাকেও বাজারের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। যখন বাজার আনে তখনই রান্না করতে যেতে হয়। কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারেনা।
আজ খুব ইচ্ছে ছিল হাসপাতালে আপাকে দেখতে যাওয়ার। বাচ্চাটা কেমন দেখতে হয়েছে, আপার শরীরইবা এখন কেমন আছে কিছুই জানতে পারেনি। আপা কবে আসতে পারবে কে জানে। দুলাভাইয়ের সামনে যেতে ইচ্ছে হয়নি তার। জানে হাসপাতালে তো নিয়ে যাবেই না উল্টো যেতে চেয়েছে বলে বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবে। যেন হাসপাতালে আপাকে দেখতে নয় সে বেড়াতে যেতে চাচ্ছে।
বাসার সামনে রিক্সার বেলের শব্দে চমক ভাঙে তার। বুঝতে পারেনা এসময় কে এলো। দুলাভাই কি বাজার নিয়ে এলো নাকি মেহমান। সে দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে যায়... আপা !
জোবেদা মাসুমার দিকে তাকিয়ে অসম্ভব মলিন মুখে একটু হাসে। দুলাভাই রিক্সাঅলার সংগে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করছে। রিক্সা থেকে নেমে আসতে আপার কষ্ট হচ্ছে সেদিকে খেয়াল নাই। মাসুমা দৌড়ে দরজা খুলে, বোনকে ধরে আস্তে আস্তে নামায়। বাচ্চাকে দাই এর কাছে দিয়ে বোনকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে আসে।
বাচ্চাটা দেখার জন্য যে সে এতক্ষণ ছটফট করছিলো মনে থাকে না। মাথার মধ্যে একটা দুঃচিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে আপাকে এখন কি খেতে দেবে। আপা নিশ্চয়ই বাসায় চলে আসছে দেখে হাসপাতালের খাবার খায়নি। আর দুলাভাই যে লোক তাকে মুখ ফুটে কিছু বলেছে বলেও মনে হয় না।
মাসুমা রান্নাঘরে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করে। সে আজ নাস্তা খায়নি ওর রুটিদুটো রয়ে গেছে। সে বোনের কাছে যায় জিজ্ঞেস করে ‘কিছু খাইবা আপা’?
‘কি আছে’?
‘রুটি আছে নাইলে ভাত বসাই, দুধ দিয়া খাও’
জোবেদা ‘দে’ বলে চোখ বন্ধ করে খাটে হেলান দেয়।
মাসুমা ঠিক বুঝতে পারেনা আপা কি দিতে বলেছে। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করেনা। বুঝতে পারে ক্ষুধার মুখে এই খাবার তাঁর পছন্দ হয়নি।
বিয়ের আগে খাবার নিয়ে আপা অনেক মর্জি করতো। স্কুল থেকে ফিরে পছন্দের তরকারী না হলে ভাতই খেতো না। সে জন্য মা ওর জন্যে আলাদা করে পছন্দের খাবার তৈরী করে রাখতো। দুলাভাই হয়তো জানেও না এসব কথা। আর জানলেই কি উল্টো আল্লাদীপনা মনে করে শাসন বাড়িয়ে দেবে।

লোকটা বাড়িতে আসার পর থেকে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তার মুখ অবশ্য ঘরে বেশীরভাগ সময়, বলতে গেলে সব সময়ই গম্ভীর থাকে। শুধু অফিসের লোকেরা বা তাদের স্ত্রীরা কখনও সখনও এলেই জানা যায় যে এই মানুষের মুখও তেলতেলে হয়।
জোবেদা আড় চোখে একবার তাকায়। তার অস্থির লাগছে। এই লোকের যে কখন কি কারণে মেজাজ খারাপ হবে, আর কিভাবে কোনদিক থেকে আঘাত করা শুরু করবে আন্দাজ করা মুশকিল। এখন মেজাজ তো খারাপ হয়েই আছে শুধু ঝারার অপেক্ষা। নিজের কথা সে ভাবে না কিন্তু মাসুমা আছে। আর দাইটাও এখনও যায়নি।এসব কাজের লোকেরা সব সময় কান পেতে থাকে আর তিলকে তাল বানিয়ে বাড়ি বাড়ি ছড়ায়। দাইটাকে চলে যেতে বলাও সম্ভব হচ্ছে না। সে বসে আছে টাকা পয়সার জন্য, টাকা না দিয়ে বিদায়

করবে কিভাবে। জোবেদা তার সর্বোচ্চ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আশা করতে থাকে যে সমেদ আলী নিজে থেকেই কাজটা করবে। কিন্তু এও সে জানে বরাবরকার মত তাকেই কথাটা বলতে হবে এবং কিছু কঠিন কথা শোনানোর পরই এ পর্বের সমাপ্তি ঘটবে।

মাসুমা রান্না শেষ করে বাচ্চাদের খাওয়াতে বসলো। হাতে বাংলা বইটা নিলো, বাচ্চাদের খাওয়াতে খাওয়াতে একটু পাতা ওল্টাবে। ইচ্ছা ছিলো সকাল সকাল বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো শেষ করে আপার কাছে শুইয়ে রেখে একটু পড়তে বসবে। কিন্তু দুলাভাই বাজারই এনেছে অনেক দেরী করে। শেষ বাজারের জাটকা ইলিশ আর বেগুন।

মাসুমা পাতা ওল্টায়। কিছুই মাথায় ঢুকছে না । সে এত কিছু সামলে পড়াশুনা করতে পারেনা। আপার মেয়েগুলি এত লক্ষী; গল্প বলার আবদার করছিল অথচ সে বুঝিয়ে বলতেই চুপ। নাবিলাটা তাও একবার বলেছিল 'খালি একটা বলেন ছোট কইরা' কিন্তু নাজিয়া থামিয়ে দিয়েছে। নাজিয়াটা একেবারে বয়স্ক মানুষের মত বুঝদার হয়েছে।
মাসুমা তাও পড়তে পারছেনা তার আফসোস হয় আপার মত মেধাবী সে নয়। কি ভাল ছাত্রীই না ছিল আপা। ফাইভ, এইট দুটোতেই বৃত্তি পেয়েছিলো। স্যাররা বলতেন থানার মধ্যে ও সবচে ভাল রেজাল্ট করবে। সেই আপার বিয়ে হয়ে গেল টেনে পড়ার সময়। আব্বা যুক্তি দিলেন লেখাপড়া করলে বিয়ের পরেও করা যাবে। কিন্তু বিয়ের পর ওরা আপাকে নিয়ে গেল গ্রামে। কয়েকমাসের মধ্যে নাজিয়া পেটে এলো। দুলাভাইতো আপাকে পরীক্ষা দেয়ানোর নামই নেয়না। আব্বা যখন ওকে আনতে গেলো পরীক্ষা দেয়ানোর জন্য, তখন সে রক্তশূণ্যতায় মৃতপ্রায়। সেই যে বন্ধ হলো তাঁর পড়া আর শুরু হয়নি, এখন হয়তো শুরুর কথা ভাবারও সময় হয় না।
মাছুমা বইটা রেখে দেয়। পড়া কিছুই ঢুকছে না মাথায় তারচে' বাচ্চাগুলোকে গল্প শোনানো ভালো।

খেতে বসে মেজাজ প্রচন্ড খারাপ হলো সমেদ আলীর। মাছুমা বেগুন আর মাছ আলাদা করে ভেজেছে। কঁচুর শাক করেছে আবার আরেকটা বাটিতে মনে হয় ডালও করেছে। মাথায় রক্ত উঠে যায় তার। মনে মনে বলে, 'নবাবজাদীর চাইর-পাঁচটা আইটেম ছাড়া মুখে রোচেনা - বাজার যা করা হইছে মনে হয় শেষ। বেজন্মা, দেখমু কাইলকা কি খাস্।'
সে বাটি থেকে শাক নিয়ে ভাত খেতে শুরু করে। মনে মনে আবার বলে 'ঢং কত, তরকারী রাইন্ধা আবার বাটীত সাজাইছে, ডেকচির থাইকা লইয়া খাইলে নবাবের বেটির মান থাকে না।'
শাক দিয়ে খাওয়া হলে মাছুমা বেগুন আর মাছের পেয়ালা এগিয়ে দেয়,'দুলাভাই বেগুন নেন।'
সমেদ আলী বেগুনের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তরকারীটা নাড়ে। তারপর জিজ্ঞেস করে, ' আইজকার বেগুনগুলা খুব ভালা জাতের না ?'
মাসুমা হঠাৎ প্রশ্নটা বুঝে উঠতে পারে না। থতমত খেয়ে সমেদ আলীর মুখের দিকে তাকায়। সমেদ আলীর মুখ দেখে সে আরও ঘাবড়ে যায়। বুঝতে পারে কিছু একটা ভুল হয়েছে। তার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই 'জ্বী' বের হয়ে আসে। এটি হ্যাঁ বোধক কি প্রশ্নবোধক বোঝা যায় না।
সমেদ আলী মাছুমার উত্তরের অপেক্ষা করে না চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'হু দেইখ্যাই বোঝা যায়। বেগুন থাইক্যা কি তেল উঠছে মনে হয় বেগুন না, খাসীর মাংস।'
মাসুমা এবার বুঝতে পারে, পেয়ালা নেড়ে নেড়ে এতক্ষণ তেল দেখছিল। সে চুপচাপ বসে থাকে কোন কথা বলে না।
সমেদ আলী বেগুন বা মাছ কোনোটাই নেয় না। ডালের বাটিটা নিয়ে ডাল ঢালে প্লেটে। তারপর বলে,'বোঝলা মাছুমা বাংলায় একটা কথা আছে, কুত্তার পেটে ঘী সয় না। আমারা হইলাম চাষাভুসার পোলা। এত তেল মসল্লার নবাবী রান্ধা, চাইর-পাঁচ আইটেম দিয়া খানা খাওয়া আমাগো অভ্যাস হয় নাই।'

মাসুমা বলতে পারতো যে সে বাড়িতে রান্না করেনা তাই আন্দাজ ঠিক হয়না সবসময়। তাছাড়া কঁচুর শাক আর ডাল সে করেছে আপার জন্য। কারন মা বলেছে প্রথম প্রথম গরুর মাংস, ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, বেগুন এগুলো না দেয়াই ভালো। আর বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না করেনি কারণ এত ছোট মাছ বেগুন দিয়ে রাঁধলে কাঁটা কাঁটা হয়ে যাবে বাচ্চারা খেতে পারবে না। আবার মাছগুলি একটু নরমও ছিল তাই কড়া করে ভেজে ফেলেছে। কিন্তু সে চুপ করে রইল কারণ এসব বলতে যাওয়া মানে আগুনে পেট্রোল ঢালা।
কিন্তু সে বুঝতে পারলো না আগুন একবার জ্বলতে শুরু করলে নিজের ধর্মেই বাড়তে থাকে, কোন ইন্ধনের দরকার হয় না।
মাসুমার শক্ত হয়ে বসে থাকা দেখে সমেদ আলীর রাগ আরও বাড়তে লাগল। গজ্‌গজ্‌ করে বলতে লাগল, 'তেজ, দুইটা বইনেরই এক রকমের তেজ। ইচ্ছা করে চুল কাইট্টা গলা ধাক্কা দিয়া বাইর করি'।

আজ বাচ্চাটার পাঁচদিন। বাচ্চার 'ছটি' উঠাতে হবে। নয়টা বেজে গেছে, জোবেদা মাসুমাকে বলে পানি গরম করার জন্য।
মাকে দেখেছে অনেক আনুষ্ঠানিকতা করতে। বাচ্চার জন্য সব নতুন জিনিসপত্র কেনায়, দুপুরে ভাল রান্না করে, বিকালে মিলাদ দেয়। অন্যান্যবার সব মা-ই করে এবার বাবা অসুস্থ দেখে মা আসতে পারেনি ওকেও নিতে পারেনি।
জোবেদার ইচ্ছে করছে সব ফেলে রেখে কোথাও চলে যেতে। লোকটা গত পাঁচদিন ধরে শুধু ফুঁসছে আর নানাভাবে যন্ত্রনা করছে। আজ ভালমন্দ রান্নাতো দূরের কথা এখন পর্যন্ত বাজারে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখছে না। জোবেদা উঠলো যেভাবে চলে চলুক সে কিচ্ছু বলতে পারবে না। মাসুমাকে পানি দিতে বলে সে চুল কাটতে বসলো।
বাচ্চার চুল কাটা, গোসল সব শেষ করে জোবেদা হাঁপাতে লাগলো। এখনও এত দুর্বল লাগে একটুতেই হাঁপ ধরে যায়। এ সময় মাসুমা এসে বল্‌লো, 'আপা এগারোটার বেশী বাজে কি রানমু ?'
জোবেদার একেবারে ধৈর্যচ্যুতি হয়। রাগ করে বলে 'ভাত রাইন্ধা ফালাইয়া রাখ'।
'ভাত রানছি তরকারী কি রানমু ?'
'আমার মাথাটা পারলে কাইট্টা কুইট্টা রান্‌ধ্‌। আর পারি না আমি।'
'সমেদ আলী বারান্দা থেকে বীরদর্পে ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠে, ' গলা নামাইয়া কথা ক' হারামজাদী, এইটা তোর বাপের বাড়ি না। বেশ্যার ঝি, তোর বাপের বাড়িত্তে টেকা আসে যে মেজাজ দেখাস'।
জোবেদাও চেঁচিয়ে ওঠে, 'মুখ সামলাইয়া কথা কও। লজ্জা লাগেনা ছোট বোনের সামনে যা খুশী তা বইলা গালাগালি করতে' ?
'কী কি কইলি বেজন্মা। তোর বইনেরে ডড়াই আমি ? দাঁড়া দেহাইতাছি শরম' বলেই পায়ের স্যান্ডেল খুলে পেটাতে শুরু করে।
নাজিয়া, নাবিলা বিবর্নমুখে চোখের পানি ফেলতে থাকে। তারা বাবার এই উন্মত্ত রূপের সাথে পরিচিত। চিৎকার করে কাঁদার সাহস অনেক আগেই হারিয়েছে। জোবেদা চুপচাপ মার খেয়েই চলেছে। মাসুমা ছুটে এসে হাতাহাতি করে স্যান্ডেল টেনে নেয়। সম্ভবত সমেদ আলীও একই সংগে মুখ আর স্যান্ডেল চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়েই স্যান্ডেলটি ফেলে দেয়।

আস্তে আস্তে মাসুমার চোখের পানি কমে আসে। সে তার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নেয়। আজই সে চলে যাবে, একাই। এখানে আর একদিনও থাকতে হলে মরে যাবে সে ।
সে বোনকে গিয়ে বলে, 'আপা আমি বাড়িতে যাব এখন '।
জোবেদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'কার সাথে যাবি'?
'একলাই'।
'এখন তো যাইতে যাইতে সন্ধ্যা হইয়া যাইব কালকে যা'।

মাসুমা ভেবেছিল আপা কিছুতেই যেতে দেবে না। তাই শক্ত হয়েছিল। কিন্তু এ কথায় আবার কেঁদে ফেললো। বললো, 'না আপা কিছু হইব না, আমি এখনই যাই। একটা বেবীটেক্সি নিয়া যাব'।
স্কুটার নিয়ে যেতে বলার আরেকটা কারণও আছে। তার কাছে তেমন টাকা পয়সা নেই। সে জানে আপার কাছেও কোন টাকা থাকে না। তাই স্কুটার নিয়ে গেলে একবারে বাড়িতে গিয়ে ভাড়া দেয়া যাবে।
কিন্তু জোবেদা একথায় রাজী হলো না। এই সময় একা একা স্কুটারে যাওয়া ঠিক হবেনা। এখানে ভাগে স্কুটার চলে অথবা লোক বেশী হলে রিজার্ভ করে নেয়। এভাবে একা একটা মেয়েকে রিজার্ভ করে পাঠালে অনেক কথা বলাবলি হবে। তাছাড়া ওটা নিরাপদও না। ও বললো 'দাঁড়া, রমিজরে খবর দেই। ও রিক্সা কইরা বাবুর হাট নিয়া চাঁদপুরের বাসে উঠায়া দিলে যাইতে পারবিনা?'
মাসুমা মাথা নাড়ে পারবে। কিন্তু টাকার কথা তুলতে পারে না।
জোবেদা নাজিয়াকে দিয়ে রমিজকে ডাকায়। 'তুই রিক্সা নিয়া কখন বাইর হবি'?
'অহনই'।
'আমার একটু উপকার কর। মাসুমারে নিয়া বাবুর হাটে গিয়া চাঁদপুরের বাসে উঠাইয়া দিবি পারবি না?' তারপর অযাচিতভাবেই একটু কৈফিয়ত দেয় 'ওর কলেজ খুলছে, পরীক্ষা। আজকেই যাওয়া লাগব।'

জোবেদা আলমারি খুললো। ওর কাছে সংসারের কোন টাকা থাকে না, বাচ্চাটা হওয়ার পর অনেকেই দেখতে এসে কিছু কিছু টাকা দিয়েছে সেখানে চারশ টাকার মত আছে। সে দু'শ টাকা নিয়ে মাসুমাকে দেয়। বলে 'রমিজরে পঞ্চাশ টাকা দিস' আর বাসে দুই সিট নিয়া বসবি'।
রমিজকে বলে 'রাতে ফিরা খবর দিবি'। রমিজ বেরিয়ে যায় রিক্সা আনতে ।
মাসুমা আবার কেঁদে উঠে। জোবেদা বললো, 'কানবিনা, ভাল কইরা লেখাপড়া কর। নিজের পায়ে দাঁড়ানের চেষ্টা কর।'
রিক্সা বেল দিচ্ছে, মাসুমা ব্যাগ নিয়ে বের হয়। জোবেদা আস্তে ডাকে 'মাসুমা শোন'
মাসুমা ফিরলে বলে ' বাড়িতে কিছু বলিসনা'।
মাসুমা একটু কঠিনভাবে বলে 'এখনও তোমার মানুষের চিন্তা, তোমার দুঃখ যাইবনা'
'বলাবলি কইরা লাভ কি। আব্বাতো কবেই সব জানছে কই করছে কোন ব্যবস্থা? তাঁর আরও তিন মাইয়ার চিন্তা আছে, সমাজ আছে। আমার তো উদ্ধার নাই খালি খালি মায়ে কানব।'
রিক্সাটা চোখের আড়াল হয়ে যেতেই জোবেদার সমস্ত প্রতিরোধ যেন এক নিমিষেই ভেঙে পড়লো। সারাদিনের লাঞ্ছনা অপমান সহস্র ফণা তুলে ছোবল মারতে থাকে তার ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, দুর্বল শরীরে। সে বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতেই থাকে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল জানে না। যখন চোখ মেললো দেখে ঘর অন্ধকার। বাচ্চারাও তার আশেপাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে উঠে বসতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। সারা শরীরে মারের তীব্র ব্যাথা। মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তার ইচ্ছে হলো এক বোতল বিষ খেয়ে সারাজীবনের জন্য শুয়ে পড়ে।

আত্মহত্যার চিন্তা একবার মাথায় ঢুকে গেলে সম্ভবত ডালপালা ছড়াতেই থাকে। জোবেদারও আত্মহত্যার নানারকম পন্থার কথা মনে হতে লাগলো। বিষ খাওয়ার ইচ্ছার সাথে সাথেই মনে পড়লো ঘরে বিষ নেই। দোকান থেকে যে কিনবে সে উপায়ও নেই। এখন যদি সে দোকানে যায়, দোকানদার নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। সে ভদ্র ঘরের বউ, এই সন্ধ্যারাতে ইঁদুরের অষুধ কিনতে যাওয়া তার জন্য শোভন নয়। অন্য কাউকে দিয়ে আনাতে গেলেও জানাজানি হবে। তাছাড়া আনাবেই বা কাকে দিয়ে। বিষের চিন্তা সে বাদ দিলো। তার মনে হলো ছয়/সাত তলা বিল্ডিংয়ে থাকলে খুব সুবিধা হতো বারান্দা বা ছাদে গিয়ে ঝাঁপ দিলেই সব শেষ।

হ্যাঁ শাড়ী পেঁচিয়ে ফ্যানের সাথে ঝুলে পরবে। কিন্তু তাও এখন করা যাবে না। বাচ্চারা এখনই জেগে উঠবে। এ ঘর ছাড়া  ফাঁস দেয়ার আর জায়গাও নাই। তাছাড়া সমেদ আলীও চলে আসতে পারে যে কোন সময়। সবাই ঘুমালে গভীর রাতে করতে হবে।
সে চুপচাপ ভাবতে থাকে। না বাসায় হবে না, সামনের বাগানের কোনায় যে পেঁয়ারা গাছটার সাথে দড়ি বেঁধে কাপড় শুকাতে দেয়, সেটাতে দেবে। গভীর রাতে যেতে হবে যেনো কেউ না দেখে। সিদ্ধান্ত নিয়েই তার ভীষণ উত্তেজনা হতে লাগলো। মনে হলো এতোদিনে সে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। নিজেকে বেশ সাহসী মনে হলো তার। উচিৎ শিক্ষা হবে সমেদ আলীর।

রাত বারোটা বাজে। তবুও রাস্তা পুরোপুরি নীরব হয়নি। সদর উপজেলাগুলি গ্রাম হলেও শহরের মানুষের পদচারনায় অনেকটাই শহরের মত হয়ে উঠেছে। রাত নিশুতি হতে অনেক দেরী হয়।
সমেদ আলী ফিরেছিল রাত আটটার দিকে। হাতে বাজার মুখে আপোষের ভঙ্গী। জোবেদা চুপচাপ রান্না করেছে, সবাইকে খেতে দিয়েছে নিজেও খেয়েছে। আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে তার একেবারে অন্যরকম লাগছে। কেমন যেন ছাড়াছাড়া, কোন দুঃখবোধ নেই। কোন কিছুতেই যেন তার কিছু যায় আসে না।
দুটো বাজতে সে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বের হলো। দ্রুত দড়িটা খুলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু বারবার হাত ফসকে যাচ্ছে। খুলতে পারছে না। ভয় করছেনা, তবু সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। মনটা ভীষণ দুর্বল আর অস্থির লাগছে। পারবে কি এই অন্ধকারে গিঁটটা ঠিকমতো বাঁধতে। ভুল হয়েছে, সন্ধ্যার সময়ই দড়িটা খুলে নিয়ে গিঁটটা বেঁধে রাখা দরকার ছিলো। সে কাঁপতে কাঁপতে অনেকটা সময় নিয়ে গিঁটটা খোলে। কিন্তু ফাঁস বাঁধতে ভুলে যায়.....বাচ্চাটা তারস্বরে কাঁদছে। এখনই দুধ দিয়ে শান্ত না করলে সারা বাড়ি জাগবে। সে দড়িটা হাতে নিয়েই দৌড় দেয়। এখানে ফেলে গেলে পরে আর খুঁজে পাবে না। বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে গিঁট বেঁধেই বের হবে।

বাচ্চাটার কান্না এখনও থামেনি। দুধ দিতে দেরী হওয়ায় ভীষণ রেগে গিয়েছে। দুধ খেতে খেতে একটু পরপরই কেঁদে উঠছে। জোবেদার বুকটা মুঁচড়ে ওঠে। এই মেয়ে আস্তে আস্তে বড় হবে। আর এই রাগ ঠান্ডা হতে হতে এই মেয়েও একদিন নাজিয়া, নাবিলার মত শান্ত আর ভীতু হয়ে উঠবে। জোর করে কিছু চাইবে না, পছন্দ না হলে প্রতিবাদ করবে না। সবাই বলবে কি লক্ষী মেয়েগুলি।
সে কাঁদতে লাগলো। একটু আগেই কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল ভেবে। সে মরে গেলে এই অভাগা মেয়ে তিনটার কি হতো। সমেদ আলীকে শিক্ষা দিতে চায় সে অথচ সবচে' বেশী লাভ তারই হতো। কি হতো সে মরলে ? সমেদ আলীর কি কোন শাস্তি হতো; বরং একটা লাভজনক বিয়ে করার সুযোগ পেতো সে। আর ভুগতো তার মেয়েগুলি। মা মরা, বাপ খেদানো মেয়েগুলি অবহেলা অনাদরে বড় হতো। এখানে সেখানে যেতো একটু আদরের আশায় আর সবাই দূর দূর করতো।
জোবেদা পাঁচদিন পর এই প্রথম বাচ্চাটাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। বাচ্চাটা দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নাড়া পড়তেই আবার ঠোঁট ভাঙে। জোবেদা চুমু খায় তার কপালে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, 'কাঁন্দিস না মা আর কোনোদিন তোর অবহেলা হইব না।'
বাচ্চাটাকে আস্তে আস্তে শোয়ায় সে। নাজিয়া, নাবিলাকেও আদর করে। নাজিয়া ঘুমের মধ্যে কি বলতে বলতে পাশ ফিরে মাকে জড়িয়ে ধরে। জোবেদা কাঁদতে থাকে। এই মেয়েগুলিকে ফেলে মরার কথা সে কিভাবে ভাবলো! সে আবার বলে 'মাফ করো মা আর কোনোদিন এমন ভুল হইব না। আমি একলাই সবাইর আদর তোমাগোরে দিমু'।
শুয়ে শুয়ে তার মনে পরে সারাদিনের হাঙ্গামায় বাচ্চাটার কোন নাম রাখা হয়নি। সে ঠিক করে এবার সে নিজে বাচ্চাটার একটা ডাক নাম রাখবে হুজুরের রাখা নামে ডাকবে না। সে মনে মনে একটা নাম ঠিক করলো 'প্রাপ্তি'। বিয়ের আগে একবার সে ঢাকায় তার এক খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে এই

নামটা শুনে তার খুব ভালো লাগে। খালা বলেছিল বিয়ের অনেক বছর পর অনেক চিকিৎসা করে এই মেয়েটি হয়েছে বলে মেয়ের বাবা বাচ্চার এই নাম রেখেছে।

তার মেয়েরা না হয় সহজেই এসেছে। কিন্তু তার কাছে তারাও অমূল্য ধন; তার জীবন। জোবেদা ঠিক করলো নামটা রাখার আগে সে নাজিয়া নাবিলার সাথে আলাপ করবে ওদের মতামত নেবে। এখন থেকে মেয়েদের নিয়ে সে গড়ে তুলবে বন্ধুত্ব আর ভালবাসার আলাদা ভূবন।

জোবেদা ঠিক করলো সে আর সন্তান ধারণ করবে না। সমেদ আলী হয়তো তালাক দেয়ার বা আবার বিয়ে করার ভয় দেখাবে। কিন্তু জোবেদা জানে সমেদ আলীর মত কাপুরুষেরা মুখেই যত তর্জন গর্জন করে। কিছু করে ফেলার সাহস থাকে না তাদের।

জোবেদা আস্তে আস্তে উঠে দড়িটা হাতে নেয়। ওটা জায়গামত রেখে আসা দরকার নয়তো সকালেই খোঁজ পরবে। দড়িটা রেখে এসে দরজা দেয় সে। ভোর হয়ে আসছে, একটু পরেই সমেদ আলী উঠবে নামাজের জন্য। তার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। যতক্ষণ এ লোকটির মুখোমুখি না হওয়া যায় ততক্ষণই শান্তি। আরও কিছুদিন সমেদ আলীর সান্নিধ্যে যেতে হবেনা ভেবে সে বেশ আরামবোধ করে। এও যেন এক রকমের প্রাপ্তিযোগই।

# তিন বন্ধুর এক সন্ধ্যা

আহসান, রুবায়েত, রোমিও হরিহর আত্মা তিন বন্ধু। একই কলেজে পড়া শেষ করে এখন একই বিশববিদ্যালয়ে একই বিভাগে পড়ে। তিন জনই তুখোড়ের চেয়ে একধাপ নীচে এবং মিডিওকারের চেয়ে একধাপ উপরের ছাত্র। আহসান এবং রুবায়েত হোষ্টেলে থাকলেও রোমিও আসে বাসা থেকে। ঢাকায় তাদের নিজস্ব বাড়ি আছে। রুবায়েত এসেছে মফস্বল শহর থেকে আর আহসানের বাড়ি গ্রামে।

রোমিও মাঝে মাঝে লেখাপড়া করার জন্য হোষ্টেলে ওর বন্ধুদের সংগে থাকে। সে কখনোই সরাসরি তাদের অর্থসম্পদের কথা বয়ান করে না। কিন্তু তার জড়তাহীন আচার-আচরণ, চালচলনের অহম, পোষাক ও অবয়বে সাচ্ছল্যের লালিত্য, বিশেষত কর্তৃত্বপূর্ন ও আত্মবিশবাসী কথাবার্তা খুব সহযেই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। পড়াশুনা করতে এলেও রোমিও যে ক'দিন হোষ্টেলে থাকে সে ক'দিন লেখাপড়ার চেয়ে আড্ডা, হৈ চৈ-ই বেশি হয়। রোমিও মজার মজার গল্প করে, উচ্চস্বরে হাসে, ওর মোবাইলে অন্যদের ফোন করতে দেয়। তাই ও রুমে এলে অন্য ছেলেরাও ভীড় জমায়।
একদিন ওরা সাত-আটজন মিলে গল্প করছে। এসময় নিউ ফার্স্ট ইয়ারের একটি ছেলে এলো। ছেলেটির বাড়ি নোয়াখালিতে। সে প কে 'ফ', ফ কে 'প', চ কে 'ছ' ছ কে 'চ' এরকম উচ্চারণের কারনে ইতিমধ্যেই হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। সে এসেছে রোমিওর মোবাইলটা চাইতে।
বললো,'ভাইয়া আপনার পোন আছে ?'
রোমিও বললো,'হ্যাঁ সবারই একটা করে আছে।' ওকে দেখেই সবাই মনে মনে হাসছিল এবার অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো।
তিন বন্ধুর মধ্যে যত আন্তরিকতাই থাক রোমিওর প্রতি কিছুটা সম্ভ্রম আলাদা করাই থাকে। তাই যখন রোমিও তাদের রুমে থাকতে আসে তখন আহসান আর রুবায়েত একটু বেশিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হয়। এ সময় তাদের দুজনের মধ্যে সুক্ষ্ম একটি ইর্ষা ও প্রতিযোগিতাও চলে রোমিওর মনের বৃহৎ অংশটি নিজের দখলে নেয়ার জন্য।
রোমিওর প্রতি অনেক মেয়েই আকর্ষিত হয়। সেও ফ্ল্যাটার্ করে। তারপর সেসব গল্প বন্ধুদের কাছে মজা করে বলে। মেয়েরা যে কী বোকা, ওদের পটানো যে কত সহয, রোমিও যে কিভাবে ওদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, নাঁকানি-চোবানি খাওয়ায় রোমিওর কাছে সে গল্প শুনে আহসান আর রুবায়েত হেসে মরে। মেয়েদেরকে তাদের কাছে বড় বেচারী মনে হয়। এই বেচারীদের সাথে জড়িয়ে নিজেকে বেচারা বানিয়ে রোমিওর খোঁচা খাওয়ার ভয়ে তারা দুজনেই মেয়েদের থেকে শতহাত দূরে থাকে।

ওরা এখন শেষ বর্ষের ছাত্র। কেউই সিরিয়াস ধরণের প্রেম করে না। আহসান দুটো টিউশনী করে। তার একটি ছাত্রী অন্যটি ছাত্র। রোমিও মাঝে মাঝে ওকে খোঁচায় ছাত্রী শিক্ষকের রোমান্টিক গল্প নিয়ে। আহসান উত্তরে 'আরে মেয়েদের পাল্লায় পড়বো আমি', 'দূর আমাকে ওরকম ক্যাবলাকান্ত ভাবিস নাকি' ইত্যাদি কঠিন মন্তব্য করে।

এরইমধ্যে একটি অভিনব ঘটনা ঘটে। আহসানের ছাত্র শিহাবের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং তার ফাইন্যাল পরীক্ষা শুরুর মুখে সে প্রায় একমাস ছাত্রটিকে পড়ানো বন্ধ রাখে। অভিভাবককে বলে যেহেতু শিহাবের এখন পড়ালেখার চাপ কম তাই তার নিজের পরীক্ষা শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সে নিয়মিত আসবেনা। মাঝে মাঝে এসে পড়া দেখিয়ে দিয়ে যাবে। তবে সে সবকিছু এমনভাবে গুছিয়ে দেবে যে শিহাবের কোন সমস্যা হবে না। আহসান অনেকদিনের পুরোনো শিক্ষক তাই অভিভাবকরাও আপত্তি

করেন না। প্রায় একমাস পর ছাত্রের বাসায় গেলে, ছাত্রের মামা আহসানকে ছাত্রের পড়া শেষ হওয়ার পর অন্য একটি বাসায় যাওয়ার জন্য পীড়াপিড়ি করতে থাকে। বার বার বলে, 'সুমি আপা বলেছে আপনি যেদিনই আসেন আপনাকে যেন তাদের বাসায় একটু নিয়ে যাই।'

আহসান জিজ্ঞেস করে 'সুমি আপা কে ?'

ছাত্রের মামা বলে, 'বাহ্ আপনি সুমি আপাকে চেনেন না ! প্রায়ই তো আমাদের বাসায় আসে আপার সাথে গল্প করে। আপনি অনেকবার দেখেছেন তো। ঐ যে কোণার বাড়িটা 'সুরভী' নাম ওখানে থাকে। একটু চলেন ।'

আহসান অস্[] ষ্টভাবে চিনতে পারে মেয়েটিকে। কিন্তু যেতে রাজী হয় না। অজানা এক ভয় ঘিরে ধরে তাকে। ছাত্রের মামা যতই অনুরোধ করে ভয় ততই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ওকে। সে সিনেমায় দেখেছে মেয়েরা বিভিন্নভাবে ছেলেদেরকে বিপদে ফেলে। একটা সিনেমায় তো নায়িকা নিজের কাপড় চোপড় নিজেই ছিড়ে ফেলে চিৎকার করে লোক জড়ো করে নায়ককে বাধ্য করেছিল তাকে বিয়ে করতে। এরকম কিছু যদি হয়। না সে কিছুতেই রাজী হয় না যেতে। ছাত্রের বাসায়ও আর দেরী করা সমীচীন মনে হয় না তার। কি জানি মামার পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত অনুরোধের ঢেঁকি গিলে বিপদে পড়ে কি না। আবার মনে হয় অন্য কোন ষড়যন্ত্র করে তাকে এখানে আটকে রাখছে না তো। শিহাবের মাও একটু আগে বেরিয়ে গেছে দেখেছে। হঠাৎ শীত লেগে ওঠে ওর। চা শেষ না করেই ছুটে বেড়িয়ে পড়ে । গলি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় এসে ভার্সিটিগামী একটা বাসে উঠে কিছুটা নির্ভার লাগে।

ভয়টা কেটে যাওয়ার পর পুরো ঘটনাটি আবার ভাবে ও। রোমিও এখন হলে আছে। তাকে শোনানোর মত একটি গল্প পেয়ে বেশ উত্তেজনা হয় তার। সে বার বার গল্পটিকে গুছিয়ে নেয়। প্রতিবারই তাতে একটি করে নতুন ডালপালা যোগ হয়। গল্পটি শোনানোর অস্থিরতায় হঠাৎ করে রাস্তাটিকে মনে হয় অনেক দীর্ঘ।

হোষ্টেলে ফিরে এসে প্রথম সুযোগেই পত্রপল্লবে বিস্তৃত ঘটনাটি সে বেশ আকর্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করে। পুরো ঘটনাটি শুনে রুবায়েৎ লাফ দিয়ে তার কাছে এসে, তার পিঠে বিশাল এক চাপড় মেরে তাকে অভিনন্দিত করে তার উপস্থিত বুদ্ধির জন্য । কিন্তু রোমিও চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে,'তুই গেলি না কেন ?'

আহসান অবাক হয়ে বলে,'যাব মানে ! কি বলিস ? কী না কী হয়, ঠিক আছে !'

রোমিও বলে,'কি হবে, তোকে রেপ করবে ?'

আহসান চুপসে গিয়ে তো.. তো করতে থাকে। 'কি যে বলিস না আমি তাই বললাম নাকি.....।'

তাহলে গেলি না কেন ? জানতে ইচ্ছে করলো না ঘটনাটা কি ?'

'যদি কোন সিনক্রিয়েট করতো ?'

'তো তাতে তোর শ্লীলতাহানি ঘটতো ? তুই পুরুষ না আর কিছু ? এতো ভাবনা চিন্তা তো করবে মেয়েরা..... তাদের কথায় কথায় চরিত্র নষ্ট হয়। তোর এত ভয়ের কি আছে। আরে, বাংলাদেশের মেয়েরা টীজ করলে সাড়াশব্দ করে না, রেপ্ড হয়ে বিচার চাইতে যায় না তারা করবে সিনক্রিয়েট.... স্[] াইনলেস, গর্দভ। রোমিও আরও কী কী বলতে থাকে।'

আহসান আর রা' করে না। রোমিওর কথা শোনার পর কিছুক্ষণ আগের ভাবনাগুলোকে একেবারে অলীক মনে হয় তার। ভাগ্যিস ওগুলো প্রকাশ করে ফেলেনি। তাহলে লজ্জার আর সীমা থাকতো না। রোমিও কি গ্রাম্যই না ভাবতো ওকে।

রুবায়েতও চুপ। তার কিছুটা আফসোসও হয় রোমিওর প্রতিক্রিয়া খেয়াল না করেই নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ফেলার জন্য।

একমাস পর ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়। হল থেকে বাইরে চলে আসতে হয় ওদের। তিনবন্ধুই আলাদা থাকলেও তিনজনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেয়ার। তাই মাঝে মাঝেই একসঙ্গে পড়াশুনা করে।

আহসান আবার তার ছাত্রদের নিয়মিত পড়ানো শুরু করে। অনেকদিন পর মেয়েটি আবার যোগাযোগ করে। এবার ছাত্রের মামাটি খুব অনুরোধ করে বলে আপনাকে ও বাড়িতে যেতে হবে না। আপনি পড়শুদিন

শিহাবকে পড়িয়ে যাওয়ার সময় শুধু ইষ্টার্ন প্লাজার গেইটে একটু দাড়াবেন। সুমি আপা থাকবে ওখানে। এবারে আহসান সম্মত হয়। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছলে মেয়েটি এগিয়ে আসে।
আহসানের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। রেমিও তাকে ক্ষেপায় যে সে নাকি মেয়েদেরকে ভয় পায়। হুহ্ মেয়েটেয়েদের ব্যাপারে সে যে কত সবল এখনি পরীক্ষা হয়ে যাক্। সে অহংকারী ভঙ্গীতে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটিকে ঠিকমতো লক্ষ্যও করে না।
মেয়েটি কথা বলতে গিয়ে খুব নার্ভাস হয়ে যায়। সে এলোমেলোভাবে দ্রু ত তার ভাললাগার কথা জানায়। তার গলার স্বর বিকৃত শোনায়। হয়ত প্রচণ্ড নার্ভাসনেসে অথবা অনিয়ন্ত্রিত আবেগের জন্য তার গলা কাঁপতে থাকে।
অন্য সময়ে, অন্য অবস্থানে এই মেয়েটিকে হয়তো ওর এত অপছন্দ হতো না । কিন্তু পুরো বিষয়টি একপাক্ষিক হওয়ায়, আর প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে অনাগ্রহী থাকায় এই মুহূর্তে মেয়েটির সাদামাটা চেহারা, অগোছাল কথা, নাঁকীস্বর সবকিছুই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বিশেষত একটি মেয়ে যেচে প্রেম নিবেদন করছে এ বিষয়টি তার মধ্যে মেয়েটি সম্পর্কে তীব্র বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়। তার মনে এমন কী মেয়েটির ভালোত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে।
তার ইচ্ছে করে কিছু শক্ত কথা শোনায়। কিন্তু অত কিছু না বলে শুধু 'ছিঃ লজ্জা লাগে না এরকম ছেলেদের পিছনে লেগে থাকতে ?' বলে রাগী চোখে মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে হন হন করে চলে আসে।
এবার আর বন্ধুদের সাথে এ ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলে না। মনযোগ দিয়ে বি.সি.এস এর পড়া পড়তে থাকে।
একসময় তিন বন্ধুই মেধার প্রমান দিয়ে বি.সি.এস পাশ করে তিন ভিন্ন উপজেলায় পোষ্টিং পায়। আহসান আর রুবায়েত চলে যায় গ্রামে আর রোমিও কলকাঠি নেড়ে থেকে যায় ঢাকায় ।
তারপর পারিবারিকভাবে প্রত্যকেই দ্রু ত সর্বোচ্চ লাভজনক বিয়েটি করে এক দু' সন্তানের জনকও হয়। সেই নিরবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব আর বজায় রাখা যায়না। তবে মাঝে মধ্যেই খোঁজ খবর দেয়া নেয়া হয়।

প্রায় চার বছর পরে এই প্রথম একটা ট্রেনিংএ আহসান আর রুবায়েত ঢাকা আসে হেড অফিসে। এখানে এসে রোমিওর সাথেও দেখা হয়। অনেকদিন পর তিন বন্ধু একসাথে হয়ে আবার আগের চাঞ্চল্য ফিরে পায় যেন।
কাকতালীয়ভাবে রোমিওর বাসাও খালি। ওর শবশুর শাশুড়ী আমেরিকা গেছেন ছেলের বাড়িতে বেড়াতে। ওরা শবশুর বাড়িতেই থাকছে একমাস ধরে, শুধু রোমিও মাঝে মাঝে এসে ওদের ফ্ল্যাটটা দেখাশুনা করে। আজ ঠিক হলো অফিসের পর তিনজনে ওখানেই থাকবে। রোমিও স্ত্রীকে বাসায় থাকার কথা জানিয়ে বন্ধুদেরকে পানের আমন্ত্রন জানায়।

রাতে বিয়ার পান করতে করতে বহুদিন পর তারা আবার পুরোনোকালের নিবিড় বন্ধুত্বের দিনগুলিতে ফিরে যায়। তারা অতীতের বর্ণিল দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে। সেই বর্ণাঢ্যময় ঘটনাগুলো আলোচনা করে। রোমিও আগের মতই তার প্রিয় বিষয় 'মেয়ে'তে ফিরে যায় ।
বন্ধুদেরকে আগের মতই খোঁচায়। রুবায়েৎ ইষৎ জড়িত কণ্ঠে বলে,'কী যে বলিস দোস্ত, তোর মতো ঢাকার বাসিন্দা নাকি ! ওটা তো গাঁও। জীবনটা একবারে আলুনি বুঝলি।'

আহসান কোন কথা বলে না, শুধু ঢক্ ঢক্ করে পান করতে থাকে। রোমিও হাসে, এই আস্তে আস্তে গিল্ শুয়ে যাবি তো। আহসান তবুও কিছু বলে না আবার হাত বাড়ায়।
রোমিও রুবায়েতের দিকে তাকিয়ে আহসানকে ইশারা করে বলে, 'বেচারা সেই যে নায়িকার দৌড়ানি খেল এরপর থেকে এ বিষয়ে একদম চুপ মেরে গেছে দেখেছিস ?'

এরপর দুজনে মিলে ঐ ঘটনা নিয়ে মজা করতে থাকে। এসময় দ্রবীভুত আহসান একটু একটু ফোঁপায়। বন্ধুরা উৎকণ্ঠিত হয়ে জোর করে গ্লাস সরিয়ে নিতে চায় কিন্তু আহসান ছাড়ে না। বিড় বিড় করতে থাকে আমি ঠিক আছি..ঠিক আছি।
তারপরই তার মুখ দিয়ে খৈ ফুটতে থাকে। হঠাৎ করে সে সুমির গল্প শুরু করে। বন্ধুদের মনে পড়ে সেই কৌতুককর অধ্যায়টির নায়িকার নাম সুমি ছিল। তারা আবার হাসে। কিন্তু আহসান যখন জানায় মেয়েটি আবার যোগাযোগ করেছিল, জানিয়েছিল তার ভাললাগার কথা। আর উত্তরে সে মেয়েটিকে নির্লজ্জতার অনুভব দিয়ে কিভাবে তীব্র বিতৃষ্ণায় ফিরিয়ে দিয়েছিল তখন তারা মনযোগী হয়।

'এরপর তো পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ করে বাড়িতে কিছু সমস্যা থাকায় আমি বাবার কথামতো কিছুদিনের জন্য চলে গেলাম বাড়িতে। বাড়িতে যাওয়ার পরপরই বাবা বিয়ের জন্য তাড়া দিচ্ছিলেন। বুঝতেই পারছিস তখন আমার বাজার দর বেশ ভালই।
এসময় আমি মেয়েটির একটি চিঠি পাই। ছোটখাট নয় তের পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি। ঠিকানা সম্ভবত আমার ছাত্রের বাসা থেকে নিয়েছিল। সেই চিঠি থেকে জানতে পারি, আমি মেট্রিক পাশ করে যখন ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য চাচার সরকারী কোয়ার্টারে থাকতাম তখন সুমিরাও সেখানেই থাকতো। ও তখন স্কুলে পড়তো তাও মাত্র ফাইভে। ওর তখন শুধু ছোট্ট একটি ভাই ছিল। তাই খেলার জন্য প্রায়ই আমার চাচার বাসায় আসতো।
আমার চাচাতো ভাইবোনগুলো ছিল প্রচণ্ড দুষ্টু। ওরা ওকে বিভিন্নভাবে কাঁদাতো। আমি তখন ওদেরকে বকে দিতাম, আর সুমির পক্ষে থাকতাম।
কখনো ওকে খেলায় সাহায্য করতাম যখন অন্যেরা ওকে চুরি করে ঠকাতো। ওখানে আমি দু'বছর ছিলাম। ওই সময়ের এরকম আরও অনেক ঘটনার কথা সে জানায় চিঠিতে। যা থেকে আমার প্রতি ওর একটা নির্ভরতা তৈরী হয়েছিল।
বাড়ির বাইরের একা নির্বান্ধব পরিবেশে আমাকে মনে হয়েছিল একান্ত আপন। যদিও সে সময় এর ব্যাখ্যা ছিল অন্যরকম। কিন্তু অনেকদিন পর আমাকে ছাত্রের বাসায় দেখে সে চিনতে পারে। আর আস্তে আস্তে আমার মহত্বের স্মৃতি, আমার প্রতি তার নির্ভরতা ভালবাসায় রূপান্তরিত হতে থাকে। তারপরের সব ঘটনা তো আমি জানিই। এভাবেই চিঠিটি শেষ করেছিল।
যদিও মেয়েটির ছেলেবেলার চেহারা বা নাম আমার মনে ছিলনা। তবে চিঠিতে লেখা ঘটনাগুলো কিছু কিছু মনে পড়ে। কিন্তু এ কাজগুলোর সাথে আমার কোন আবেগ তো জড়ানো ছিল না। ছোট একটা বাচ্চাকে আমি প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করেছি বড় হিসেবে, কোন আবেগ থেকে নয়। এরকম আরও অনেককেই করেছি হয়তো। সেসব কি আর মনে থাকে।
চিঠিটা পড়ে মেয়েটার প্রতি যে বিরক্তিটা ছিল সেটা কমলো। কিন্তু তার বেশি কিছু না। বরং ইষ্টার্ন প্লাজার গেইটে দাঁড়ানো কান্না কান্না চেহারার মেয়েটির কান্ডকারখানার কথা মনে পড়ে আবার হাসি পেলো। আমি ওর চিঠির কোন জবাব দিলাম না।
এর মধ্যেই পোষ্টিং হওয়ার পর আমি আবার ঢাকায় আসি। ঢাকায় সবার সঙ্গে দেখা করে ঠিকানা দিয়ে চলে যাই গৌড়িপুর। এরপর আরও তিন-চার মাস কেটে গিয়েছে। বাড়িতে মেয়ে দেখাদেখির বেশ তোড়জোর চলছে তখন। কিছু তারা নিজেরাই রিজেক্ট করে দেয়। আর যেগুলো বিবেচনাধীন সেগুলো ছবি বায়োডাটাসহ আমার কাছে পাঠায়। অত্যধিক পছন্দগুলোতে চিহ্ন দিয়ে আব্বা বিস্তারিত বিবরণ লেখেন। সাথে মা, বোন অন্যান্যদের মন্তব্যও উল্লেখ করেন। আমিও মানসিকভাবে অনেকটাই তৈরী বিয়ের জন্য।
গৌড়িপুরে আমি তখন মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছি। এখানের অফিসারদের বাসায়ও বেশ যাতায়াত আমার। সবচে' খাতির হলো ইউ,এন,ও সাহেবের সাথে। ঠিক এসময় একদিন ইউ,এন,ও সাহেবের বাসায় গেছি । ভাবী তার ছোট বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন নাম সুস্মিতা।

আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো মেয়েটিকে আমাকে দেখানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে আনা হয়েছে। এরকম প্রায়ই হয়। তবে ইউ,এন,ও সাহেবের শালী আপত্তিরও তো কিছু নেই। মেয়েটিকেও ভালই লাগল, বিকেলটাও কাটলো বেশ সুন্দর। ভাবী গান করেন। আমরা প্রায়ই বাসায় গিয়ে ওনাকে গান শোনানোর অনুরোধ করতাম উনিও শোনাতেন। সেদিনও গানের পর্ব ছিল। ভাবী গাইলেন তার বোনও গাইল। অন্যদের কথা জানি না আমার কাছে তার বোনের গানই ভাল লাগলো বেশি।
মেয়েটির চেহারা পরিচিত লাগছিল। ভাবী যেন একবার সুমি বলে ডাকলোও। তবু ইষ্টার্ণ প্লাজার সেই ফ্যাকাশে, ঘর্মাক্ত কলেবর মেয়েটির সাথে মেলাতে পারলাম না। একবারও সন্দেহ হলো না।

পরদিন মেয়েটি অফিসে এলো। দুলাভাই এর অফিস দেখতে, তবে আমার অফিসে বেশ খানিকটা সময় কাটালো, অবশ্য আমার অনুরোধেই। বিকেলে আমি আবার গেলাম তাদের বাসায়। অনেকক্ষণ গল্প করলাম আর জানলাম ওর আসল পরিচয়। জানলাম বাসায় ওকে সুমি ডাকে।
এক ঘনিষ্ঠ আলোচনার মধ্যে সুস্মিতা ঐ কথা ওঠানোর পর বিশেষ করে চিঠিটির কথা জিজ্ঞেস করায়, এতদিন পর আমি নিজের নিষ্ঠুরতার কথা মনে করে খুবই সংকুচিত হয়ে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল এবার সুমি কিছু কঠিন কথা শোনাবে। কিন্তু ও সেসব দিকে গেল না। আবার গল্প করতে লাগলো খুব সুন্দরভাবে। রাত হয়ে যাওয়াতে সাধাসাধি করে ভাত খাওয়ালো। তারপর ফেরার পথে এগিয়ে দিলো।
রুবায়েত চেঁচিয়ে উঠলো,'যত্তো গাঁজাখুড়ি। তুই বলতে চাচ্ছিস মেয়েটাকে আগে দেখার পরও তুই তাকে চিনতেই পারিসনি ?'
'না আগে আসলে তাকে এড়ানোর চিন্তাটাই সবসময় কাজ করতো মাথায়। তাই সেভাবে লক্ষ্যই করিনি।'
'তবুও ঠিক মানা যাচ্ছেনা।'
আহ্সান রেগে উঠলো, 'মানা না গেলে কিচ্ছু করার নাই, চুপ করে থাক।'
রোমিও ইশারায় রুবায়েতকে চুপ থাকতে বললো। রুবায়েত বললো,'আচ্ছা যা চুপ করলাম।'
এ সময় আহসান নিজেই আবার বললো,'না চেনার একটা কারণও ছিল। আমি মেয়েটাকে সব সময় সালোয়ার কামিজ পরা দেখেছি আর তখন চুল ছোট ছোট করে কাটা ছিল । কিন্তু ঐ সময় অর্থ্যাৎ বোনের বাসায় যখন দেখলাম তখন শাড়ী পরা ছিল আর চুলও বড় ছিল; মনে আছে বেশ সাজগোজ করেছিল।'
যাই হোক নিজের নিষ্ঠুরতার জন্য এই প্রথম যেমন অনুতাপ হচ্ছিল তেমনি সুমি যে সেই ছেলেবেলা থেকেই শুধুমাত্র আমাকেই ভালবেসেছে এটা ভেবে খুবই ভাল লাগছিল। বাসায় গিয়ে চিঠি রাখার থলিটার ভিতর থেকে খুঁজে পেতে চিঠিটা বের করলাম। নিজের ভাগ্যকে অনেকবার ধন্যবাদ দিলাম ওটা ছিঁড়ে ফেলিনি বলে। সারারাত চিঠিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্ত করে ফেললাম। অবরুদ্ধ আবেগ যেন সহস্র ধারায় ফেটে পড়তে লাগলো।

সুমিকে বিয়ে করছি এটা অমোঘ সিদ্ধান্ত মনে হলো। বাড়িতে একটা বিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল সামনের শুক্রবারে মেয়ে দেখে পছন্দ হলে বিয়ে হয়ে যাবে, পড়ে অনুষ্ঠান। কিন্তু বৃহস্[] তিবারে সুমিকে এখানে রেখে আমি কিভাবে যাই। তাই বাবাকে চিঠি লিখে দিলাম এ সপ্তাহে আসতে পারবো না।
যদিও চিঠি পৌঁছতে পৌঁছতে শুক্রবার পার হয়ে যাবে। ফলে বাবার সাথে বিরাট ক্লেশ তৈরী হবে। তারপর হঠাৎ ঐ বিয়ে ভেঙে এখানে তাঁকে রাজী করানো হয়তো সম্ভবই হবে না। তবু আমার কোন ভয় বা প্রতিক্রিয়া হলো না। আমি ঐ মুহূর্তে সুমিকে ছেড়ে যেতে পারবো না এটাই চরম সত্য।
পরদিন আবার গেলাম সুমিদের বাসায়। অনেক গল্পও হলো। অবশ্য কথা আমিই বেশি বললাম। সুমি শুনলো চুপচাপ। অবশ্য যে ধাক্কা সে খেয়েছে একটু ভয় পাওয়ারই কথা। আমিও সরাসরি কিছু বলি না। মনে মনে বলি এই তো আর ক'টা দিন। তারপর তোমার জন্য জীবনের সবচে' বড় সারপ্রাইজটা অপেক্ষা

করছে। বাড়িতে গিয়ে সব ঠিকঠাক করেই তোমার দুলাভাইকে প্রস্তাব দিয়ে পাঠাবো তোমাদের বাসায়। তারপরই তোমার এত বছরের লালিত স্বপ্ন পূরণ হবে।

পরদিন সুমি বলে শনিবারে চলে যাবে। আমি তো অবাক এক সপ্তাহেই বেড়ানো শেষ! বোনের বাসায় বেড়াতে এসেছো থাকো আরো ক'টা দিন। কিন্তু ও হাসলো, বললো বেশিদিন থাকা যাবে না। কথা ছিল এখানে পাঁচদিন থাকবে আর খালার বাসায় দু'তিন দিন। কিন্তু এখন তো এখানেই সাতদিন হয়ে গেল। কাল যাবে ময়মনসিংহে। খালার বাসায় একদু' দিন থেকে ঢাকা চলে যাবে।

সেই দুটো দিনও আমি ময়মনসিং-গৌড়িপুর ছুটোছুটি করে কাটালাম। কী দিন গেছে ! প্রতিটি সকাল হতো বিকেলের অপেক্ষায়। সারদিন অফিসে ঘড়ি দেখা আর দুটো বাজলেই অফিস পালানো, সারাটা বিকাল ব্রক্ষ্মপুত্রের পাড়ে কাটিয়ে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যেতো। দু'দিন পর সুমি ফিরে গেল ঢাকায়। তারপর শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা..... শুধু ঘড়ি দেখা। না ও ফোন করে, না চিঠি লেখে।

লজ্জার মাথা খেয়ে দুদিন গেলাম ইউ,এন,ও সাহেবের বাসায়। যদি ওর কোন খবর মেলে। কিন্তু তাঁরা সুমির কথা আমার সঙ্গে কেন আলাপ করবেন। তাদের সামনে তো সুমির সঙ্গে তেমন কোন কথা হয়নি। আর তখনই খেয়াল করে দেখলাম আসলে সুমি এ ব্যাপারে নতুন কোন কথাই বলেনি। আমি ছুটে ছুটে গেছি আর সে পরিচিতের মত গল্প করেছে। আগের স্মৃতিচারণ করলে হেসেছে। কিন্তু কোন প্রতিশ্র[] তি চায়নি বা দেয়নি। তাহলে ! আমি কেন ওর চিঠির অপেক্ষা করছি ! কেন সব কিছু নির্ধারিত ধরে নিয়ে বসে আছি। ধ্বক্ করে উঠলো বুকের ভেতরে।

নিজেই ছুটে গিয়ে ফোন করলাম ওদের বাসায়। ফোন সুমিই উঠালো। আমি হড়বড় করে অনেক কিছুই এক নিঃশবাসে বলে ফেলতে লাগলাম। ও চুপ করে রইলো। তারপর একটু থামতেই বললো, ও বাইরে যাচ্ছে ফিরে এসে কথা বলবে। ওর দেয়া সময়ে আবার ফোন করলাম। শুনলাম তখনো ফেরেনি। আরো রাতে ফোন করলাম শুনলাম কোন আত্মীয়ের বাসায় রয়ে গেছে।

কিছুদিন পর ইউ,এন,ও সাহেব ছুটি নিলেন। সুমির বিয়ে। বিয়ের পর কানাডা চলে যাবে তাই এনগেজমেন্টের পর এসেছিল ক'টা দিন বেড়িয়ে যেতে।

'কিন্তু আমি জানি, আসলে বোনের বাসায় বেড়াতে নয়। ওতো আমার সব খবরই রাখতো। নিশ্চয়ই জানতো আমি গৌড়িপুরে আছি। সেজন্যেই এসেছিল।'

আহসান আবার ফোঁপাতে থাকে। দুটি অহংকারী পা যেন তার মস্তিস্কের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত দলিত মথিত করতে থাকে। রুবায়েত জড়িয়ে ধরে রাখে ওকে কিন্তু কোন সান্ত্বনার কথা বলতে পারে না। নারী চরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ রোমিও-ও কোন মন্তব্য করতে পারে না। শুধু ঝপাং ঝপাং করে বিয়ারের ক্যান খুলে স্তব্ধতা ভাংতে থাকে।

# পরাজিত জীবন যাপন

চিঠিটা দুপুরে এলো। রেজিস্ট্রি ডাক। আমি খেতে বসেছি বুয়া এসে বললো,'আম্মা পিওনে চিঠি লইয়া আসছে। আইজকা আবার হের কি হইছে, আমারে দেয় না। কয় আপনের যাওন লাগব।'
প্রচণ্ড ক্ষুধার মুখে এক গ্রাস মাত্র মুখে দিয়েছি। এ সময় উঠতে ইচ্ছে করে না। তবু হাত ধুয়ে উঠতে হলো। বুঝতে পারছি রেজিস্ট্রি চিঠি হবে।
এনভেলাপটা হাতে নিয়ে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা উধাও হয়। প্রেরক 'ফারজানা'। কোন ফারজানা ? আমার ঠিক বান্ধবী নয় বান্ধবীর মত, সেই ফারজানা কি ?..... আগামী পরশু যার কুলখানি!
ফারজানা কোনোদিন চিঠি লেখেনি আমাকে। আমি তার হাতের লেখা চিনিনা। কিন্তু তবু বার বার মনে হচ্ছে এ যেন সেই ফারজানারই চিঠি। আমি স্মৃতির গহীণে আতিপাতি করে অন্য ফারজানার অস্তিত্ব খুঁজলাম। নাহ্ আমাকে চিঠি লিখতে পারে। এমন কোন ফারজানার কথা মনে পড়ছেনা।
অবশ্য এই ফারজানার সাথেও আমার চিঠি লেখার সম্পর্ক ছিলনা। তবু বিচিত্র অনুভবে আমি নিশ্চিত হই, আমার ভাবনা ভুল নয়। আমি যে ফারজানার কথা ভাবছি চিঠিটি অবশ্যই তার। চিঠিটা খোলার আগেই আমি ভাবতে শুরু করি কি লিখতে পারে সে আমাকে।
ফারজানাকে এককথায় আমার বান্ধবী বলা চলে না। আমরা এক সংগে বড় হইনি, এক জায়গায় লেখাপড়া করিনি এমন কি আমাদের সম্পর্কও আপনি থেকে তুমিতে নামেনি। মাত্র এক-দেড় বছর হবে আমরা একে অন্যের পরিচিত। ও বয়সে আমার পাঁচ ছ' বছরের ছোট হবে। আমাকে কি ডাকতো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তবে আমি ফারজানাই ডাকতাম। প্রথম পরিচয় আপনি দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে আর সরা হয়নি। ফারজানাও বলেনি কখনো। তবে ও আমার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করতো। প্রায়ই নিজে থেকে ফোন করতো।
কিন্তু কথা বলতো খুব কম শুনতোই বেশী। ফোন করলে যদি বলতাম ' কি ব্যাপার' উত্তর দিতো,'এমনিই' তারপর চুপ। আমিই জোড়াতালি দিয়ে কথা চালিয়ে যেতাম।
এক লহমায় এসব কথা মনে করতে করতে আমি এনভেলাপটি উল্টে পাল্টে দেখি। কিন্তু খুলে দেখা হয় না কি আছে এর ভেতরে। ফারজানা.... যে মাত্র তিনদিন আগে অনেকগুলি ঘুমের অষুধ একসংগে খেয়ে তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে, অথচ, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' জাতীয় কোন নোট রেখে না যাওয়াতে যাকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কোনদিন ক্ষমা করবে না, সে কি এই চিঠিতে কোন বয়ান দিয়ে গেছে ? অষুধগুলি খাওয়ার আগে সে একটি চিঠি লিখে পোষ্ট অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করেছে অর্থ্যাৎ সে পরিকল্পনা করেই সব করেছে ঝোঁকের মাথায় না। কিন্তু তার কাছের মানুষদের কি একটুও সন্দেহ হয়নি! তার স্বামীর! তাছাড়া ও তো সুস্থও ছিলনা তেমন। সুস্থ অবস্থায়ই যেখানে একা বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি ছিলনা সেখানে...!
ফাজানার সংগে ওর মৃত্যুর মাস খানেক আগে দেখা হয়েছিল। ওর একটি মেয়ে হয়েছিল কিন্তু জন্মের ন'দশ দিন পর মারা যায়। হওয়ার সময়েই বিভিন্ন রকম জটিলতা হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু তখনই যাইনি। আমার উপস্থিতি ও বাড়িতে খানিকটা অসাচ্ছন্দের জন্ম দেয়। তাই বাচ্চা হওয়ার পর দেখতে যাওয়া হয়নি। ভেবেছিলাম প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটুক তারপর যাব।
মৃত্যুর খবর শুনে ছুটতে ছুটতে গেলাম। গিয়ে দেখি তখনো ফারজানা প্রচণ্ড অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছে। ওকেও মৃতই মনে হচ্ছিল। তখনই শুনলাম ডাক্তার সিজারিয়ান অপারেশনের কথা বলেছিল। উত্তরে ওর শাশুড়ী বলেছে 'ঐসব ব্যবসার ফন্দি আমার লগে খাটবো না। বাড়াবাড়ি করলে রুগী লিয়া যাই, বাসায়ই খালাস করামুনে। আমাগো হয় নাই দশটা বারটা কই তহনতো পেটে ছুড়ি চালান লাগে নাইক্যা।'

তাপর একবার বাসায় আবার অন্য ক্লিনিকে সেখান থেকে মেডিক্যাল ... এসব করে আর অপারেশনের সুযোগও ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফরসেপ ডেলিভারি হয়েছিল। হওয়ার পর থেকেই বাচ্চাটা অক্সিজেনের অভাবে ভুগছিল দশ দিনের মাথায় তো মারাই গেল।

নাহ্ ফারজানা মোটেই কাঁদেনি। তাকিয়েছিল চুপচাপ। আমি 'যাই' বলতেই ঘাড় কাত্ করলো। সব কিছু কি স্[] ষ্টভাবে চোখের উপর ভাসছে!

বুয়া এসে বললো,'আম্মা আগে খাইয়া নেন।' ওর কথায় চমক ভাঙলো। চিঠিটা হাতে করে বসেই আছি। নিজের বোধশূণ্যতায় নিজেরই অবাক লাগে। একটু কৌতুহলও হচ্ছে না চিঠিটা পড়ার ? নাকি অবচেতনে কোন ভয় কাজ করছে যে এর ভেতরে ভয়ানক কোন তথ্য আছে যা আমাকে ছুটিয়ে বেড়াবে অথচ আমার কিছুই করার থাকবে না। আর অসহায়তা ক্রমাগত কষ্ট দেবে আমায়।

আমি চিঠিটি খুলতে শুরু করলে বুয়া আবারও খাওয়ার কথা বলে। আমারও মনে হয় হ্যাঁ আগে খেয়ে নেয়াই ভাল। পেটভর্তি থাকলে অনুভুতিগুলি ভোঁতা হয়ে যায়। দুঃখ বেদনা তীব্রভাবে আক্রান্ত করতে পারে না। কিন্তু আমি কোন ক্ষুধা অনুভব করি না। বুঝতে পারি আমি এখনো ততটা নৈর্ব্যাক্তিক হতে পারিনি যতটা হলে অসাধারণ হওয়া যায় । চিঠিটা এরই মধ্যে আমাকে আক্রান্ত করেছে। আমার চোখ পড়ে মেলে রাখা কাগজটির কোণে। যেখানে লেখা 'ইয়াসমিন শ্রদ্ধাস্পদেষু'।

সম্বোধনটি আমার কাছে অভিনব মনে হয়। বিশেষত ফারজানা আর আমার চিঠি হিসেবে। আতীয়তার সুত্রে এক অনুষ্ঠানে ওর সংগে আমার পরিচয়। তারপর আস্তে আস্তে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা। শ্রদ্ধার এ আসন সে কবে থেকে আমাকে দিলো বুঝতেই পারিনি। আমি আবার পড়তে থাকি-

'এখন আমার বয়স ছাব্বিশ। বিশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। বলা ভালো করেছি। কারাগার থেকে মুক্তির এর চেয়ে সহয রাস্তা জানা ছিল না তখন। এও জানা ছিল না যে নারীর মুক্তি আসলে কোথাও নেই। নানা রকমের কারাগারে বন্দী থেকেই সমাধা হয় তার জীবনচক্র।

ছেলেবেলা বলতে তেমন কিছু ছিল না আমার। জীবনের বিশটি বছর কেটেছে এক প্রচণ্ড পরাক্রমশালী অর্ধোন্মাদের রচিত কারাগারে। এই কারাগারের সমস্ত নিয়ম কানুন রচিত হয়েছিল বেহেস্তে যাওয়ার সহয উপায় হিসাবে। তবে সেই নিয়ম শৃংখলা বিশেষভাবেই মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ঘরের কাজ আর পরকালের সঞ্চয় এর মধ্যেই জীবন ছিল বাঁধা । ছোট ছোট দুটি ঘরের পাখির মত বাসায় একগাঁদা মানুষের গাঁদাগাদি ভীড় থেকে মুক্তি মিলতো কেবল স্কুলে যাওয়া হলে। কিন্তু সেটা খুব সহয ছিল না। স্কুলে নাম থাকলেও মা প্রতি বছর একটি ভাইবোন জন্ম দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তেন তাই সংসারের অনেক দায়িত্বই আমাকে নিতে হতো। তাই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া হতো না। সবচে' ছোট ভাই বা বোনটির বাইরে বের হওয়ার সময় হলে অর্থ্যাৎ চার/পাঁচ মাস বয়সের সময়, যখন বাচ্চাদেরকে বাইরের আলো হাওয়ার পরশ দিতে হয় তখন বিকেল হলে আমি ওদেরকে কোলে নিয়ে বের হতাম। আমার সমবয়সীরা খেলাধুলা করতো, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। এটুকু আকাশই আমার ছিল ।

আমার পিতা পছন্দ করতেন না তাই মামাবাড়িতে আমাদের যাওয়া বা সেখান থেকে কেউ আসা প্রায় ছিলনা বললেই চলে। ছোটবেলায় দেখতাম নানী শুধু মাঝে মধ্যে মামাদের কাউকে নিয়ে আসতেন। তখন খুশির চেয়ে ভীতই থাকতাম বেশি। কারন সেখান থেকে কেউ এলেই মার কান্নাকাটি বেড়ে যেত। বাসায় একটা অস্বস্তিকর নীরবতা কুণ্ডলী পাকাতে থাকতো, তখন আমরা নিঃশবাসও ফেলতাম সাবধানে।। অনেকটা ঘুর্ণিঝরের দশ নম্বর বিপদ সংকেত পাওয়া আটকে পড়া দ্বীপবাসীর মত, ঝরটি কখন শুরু হবে সেই আতঙ্কে ও অসহায়তায় স্তব্ধ হয়ে থাকতাম।

বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে যাওয়া বা সময় কাটানোয় সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও যাওয়ার পথে এত বাধা ছিল যে তা পেড়িয়ে যাওয়া আর হয়ে উঠতো না। অনেকগুলি ভাইবোন ছিল যেহেতু, তাই প্রায়ই কারও না কারও অসুখ লেগেই থাকতো। কারও অসুখের সময় বেড়াতে যাওয়ার আবদার করার আস্[] র্ধা দেখানোর মত অর্বাচীন আমি ছিলাম না। তাই বন্ধুদেরকে নিজেই মানা করে দিতাম। কখনো গ্রাম থেকে আতীয়রা আসতো। তারা ছিল আমাদের ভি.আই.পি মেহ্মান সুতরাং তখনো বলা যেত না। আর যখন বলা সম্ভব হত

তখন মাকে বললে তিনি বলতেন বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যেতে। সেটা আর আমি পেরে উঠতাম না।

একটু বড় হওয়ার পর শৃংখল আরও সুদৃঢ় হলো; বাইরে কখন,কোথায় চরিত্র নষ্ট হয়। যদিও ছোট বেলা থেকে শুরু হয়ে তখনও পর্যন্ত নিকটাত্মীয় এবং পিতার পছন্দের মানুষেরাই অন্ধকারের অনুভব দিয়েছে আমাকে। ওই ভয়ংকর রাতগুলি পার করতে কত কলাকৌশলের আশ্রয় যে নিতাম! কখনো জোর করে জাগিয়ে দিতাম ছোট ভাইবোন কাউকে তারপর তাকে কোলে নিয়ে বসে থাকতাম অথবা সারারাতই প্রায় বাথরুমে দৌড়াদৌড়ি করে কাটিয়ে দিতাম। তবু বলতে পারতাম না কাউকে; যেন আমিই অপরাধী।

তারপরেও আমি মেট্রিকটা ভালভাবেই পাশ করেছিলাম। তারপর থেকেই বিয়ের চিন্তাভাবনা শুরু হয়। কিন্তু বিনা খরচে বিয়ে দেয়া তো আর অত সহয নয়, তাই পাত্র জুটানোও সহয হচ্ছিল না। সুতরাং একেবারে ঘরে বসিয়ে না রেখে আমাকে নামমাত্র কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। কলেজ একটু দুরে হওয়ায় রিক্সাভাড়ার অভাবেই কলেজে যাওয়া হতো না। বাসা থেকে অবশ্য বলা হতো নিরাপত্তার কথা। তাছাড়া পাশ করার জন্য লেখাপড়া করাটাই যে আসল, কলেজে যাওয়াটা নয় সেটাও বলা হত।

যাই হোক আমি বিভিন্ন উপায় বের করতাম কলেজে যাওয়ার। কলেজেই বন্ধুত্ব হল রিনির সাথে। ওর বাসা আমাদের এলাকাতেই। মাঝে মাঝেই পড়ার খোঁজ নেয়ার কথা বলে ওদের বাসায় যেতাম। সে সময়েই আমার স্বামী হাসানের সংগে পরিচয়। তার অল্প পরেই প্রথম সুযোগেই বিয়ে করি।

নতুন জীবন শুরু হলো আরেক পরাক্রমশালীনির কর্তৃত্বে। শৃংখল ভাঙার চেষ্টা করে যেই মেয়ে তার আর দুর্গতির সীমা থাকে না। কাজেই আমি বাঁধা পড়লাম কঠিন নিগড়ে। হৈমন্তী তবু কিছুদিন আদর যত্ন পেয়েছিল সন্তানদের সম্ভাবনার কারনে। কিন্তু আমি যেহেতু ঝাড়া হাত পা নিয়ে ঢুকেছিলাম তাই দ্বিধার কোন অবকাশ ছিল না। প্রথম থেকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা সহয হয়েছে। তাছাড়া আমি তাদের ছেলেকে নষ্ট করেছি সে রাগটাও এর সাথে যোগ হয়েছিল।

আপনি ভাববেন না যেন আমি নিজেকে হৈমন্তীর সাথে তুলনা করছি। না তা আমি করছি না। হৈমন্তীর সাথে আমার যোজন যোজন ব্যবধান। আমার কোন বাবা ছিল না। হৈমন্তীর মতো স্বপ্ন বাবাতো নয়ই। আর জন্মদাতার কথা তো আগেই লিখেছি।

আর এদিকে আমার স্বামী বিয়েটা ঝোঁকের বশে জেদাজেদি করে করে ফেলেছিল। কিন্তু বিয়ের পর আমার অবস্থানটা বুঝে নিতে তার দেরী হয়নি। বিয়ের পর পরই তার বোধদয় হলো। কাজেই দিবগুন ভক্তিতে প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করলো। আর ঐ যে পরিবার ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিলাম এবার এটাই বুমেরাং হলো। শিকল পড়লো আমার সর্বাঙ্গে।

তাই আমি সবার মন পেতে, নিজের অবস্থান স্থিত করতে দ্রুত সন্তান ধারনের চেষ্টা করতে থাকি। আর সে কাজ সম্পন্ন হতে যতই দেরী হচ্ছিল ততই আমি তটস্থ হয়ে উঠছিলাম। আমিও আমার বাবার শেখানো পথ ধরে আশ্রয় নেই ধর্মকর্মের। প্রাণপণে একটি ছেলে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে থাকি। যে সন্তান আমার অস্তিত্বের রক্ষাকবচ হবে। হৈমন্তীর মতো আত্মাভিমান, আত্মর্যাদা মানায় না আমাকে।

আমার মেয়েটি মারা গেল। সে কী শুনতে পেয়েছিল তার মায়ের হৃদয়ের কথা..... তাই কী অভিমান করেই ছেড়ে চলে গেল!

যাক ভালই হলো। বেঁচে থাকলেও তো অন্ধকারের বিভিন্ন অনুভব নিয়ে বেড়ে উঠতো। কানাগলিতে হোঁচট খেতে খেতে সমাধা করতো জীবন চক্র। আমি তো ওকে রক্ষা করতে পারতাম না, লড়াই করার শিক্ষাও দিতে পারতাম না। এমনকি জীবনের সার সত্যটিও জানাতে পারতাম না অকপটে।

হ্যাঁ আমি অনেক আগেই জেনে গেছি নারীরা শুধুই অবহেলার শুধুই অসম্মানের। খাঁচার পাখী যতক্ষণ আপোষ না করে, মালিক খাঁচায় তালা দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয় না পায়েও শিকল পড়ায়। তারপর যখন সে সম্পুর্ন বশ্যতা স্বীকার করে শেখানো বুলি আওড়ায় শুধু তখনই তার কদর হয়। আর না হয় মৃত্যু।

আমাদেরকেও কি শিক্ষা নিতে বা দিতে হবে ক্রমাগত পোষ মানার অথবা আত্মহত্যা..... কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয় কি?

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসেই থাকি। ফারজানা কোন ইতি টানেনি নামও সবাক্ষর করেনি। ইতি টানার ভার কি সে আমাকে দিয়ে গেল? কিন্তু আমি কিইবা করতে পারি, পেরেছি বা পারছি।

এই বোকা মেয়েগুলো শুধু শুধুই আমাকে শ্রদ্ধার আসনে বসায়, আমার উপর নির্ভর করে। বোঝেনা এরকম স্বপ্নময় চোখ, ভাবুক মন আর সৎ মস্তিস্ক যদি আমার থাকতো তাহলে আমার পরিণতিও এমনই হতো। এই পোষাকী সম্মানটুকু অর্জনের  জন্য তাকে নিরাপদ রাখার জন্য আমাকেও প্রতিনিয়ত সুক্ষন হিসাব নিকাশ করতে হয়।

এই সমাজ নারীদের বিদ্রোহ সহ্য করে না।  সমাজের এঁকে দেয়া লক্ষ্মণ রেখার বাইরে পা ফেললেই পদস্খলন। একবার হিসাবে ভুল হয়ে গেলে সেই পাপ মোচন করতে হয় জীবন দিয়ে।

ও ঠিকই বলেছে, একটু ভদ্রস্থ হয়ে বাঁচার জন্য আমরা আসলে অধীনতাকেই স্বীকার করে নেই প্রথমে। অধীনতাকে মেনে নেয়াই এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।  তারপর যতটুকু স্বাধীনতা পাওয়া যায়.....দয়ার দান। মাত্রাটায় হয়তো পার্থক্য থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দয়াই তো !

# রত্নগর্ভা

বুকে ব্যথা নিয়ে সাবিহা বেগমের ঘুম ভাঙলো। তিনি আস্তে আস্তে পাশ ফিরে ঘরির দিকে তাকালেন। ছ'টা বাজে। ক'দিন ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বুকের কাছটায় ভার ভার লাগে।

সাবিহা বেগম আবার চোখ বন্ধ করলেন। তার প্রতিদিনই এ সময় ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু এখন উঠে বসে থেকে লাভ নেই। কাজের মেয়েটা আসবে সাত বা সাড়ে সাতটার  দিকে। উনি উঠে দরজা খুলে দিলে মেয়েটা নাস্তা তৈরী করতে করতে আটটায় এলার্ম বাজে, তখন সবাই উঠবে।

তিনি আবার চোখ খুললেন। নাহ্ ব্যথাটা বিন বিন করে অস্বস্তি ছড়াচ্ছে। একটু পানি খেয়ে দেখা যায়। তার ছেলে শফিক ডাক্তার। বলে, 'সকালে বেশিক্ষণ খালি পেটে জেগে থাকলে গ্যাষ্ট্রিক হয়। তুমি সকালে নামাজের পর একটু কিছু খেয়ে নিও।'

সাবিহা বেগম কিছুদিন তাই করেছেন। সকালে একটু চা বানিয়ে টোস্ট বিস্কিটে ভিজিয়ে খেয়েছেন। ভালই লাগতো। কিন্তু কিছুদিন যেতে বউমা বিরক্ত হতে লাগলো। সকালবেলা রান্নাঘরে ঢুকলে আওয়াজ হয় তাতে তার ঘুম ভেঙে যায়।

সে কয়েকবার এ কথা বলার পর একদিন শফিকও বললো, 'মা এত সকালে তুমি চা খাও এটাতো শরীরের জন্য ভালো না। সকালে দু'টা বিস্কিট আর দু গ্লাস পানি খাবে। পরে নাস্তা খেয়ে চা খেও। আর এ বয়সে তো চা না খাওয়াই তোমার শরীরের জন্য সবচে' ভাল।'

তো তারপর থেকে তিনি চা খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। এমনিতে চা তার বিশেষ পছন্দ না। তবে সকালে শুকনো বিস্কিট খেতে পারেন না। চা তে বেশি করে দুধ চিনি দিয়ে বিস্কিটের সাথে খেতে বেশ ভাল লাগতো। তো ডাক্তারের নিষেধ যখন কি আর করা। এ বয়সে ডাক্তারের কথা তো শুনতেই হবে। বয়সও কম হলো না। তার অবশ্য শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো। এই বয়সের অসুখ ডায়াবেটিস, প্রেসার, কোমড় ব্যথা, হাঁটুর বাত কিছুই নেই। শুধু মাঝে মধ্যে একটু ঢেঁকুর ওঠে। তখন দু'চামচ গ্যাষ্ট্রিকের অষুধ খেয়ে নেন।

সবাই বলে তার ছোটোখাটো ছিপছিপে শরীরটার জন্যেই নাকি তিনি ভাল আছেন। শুনে হাসি পায় তার। আর মনে পড়ে স্বামীর কথা। কি আফসোস ছিল, তার এই পাতলা চিৎলা শরীরের জন্য। সব সময় বলতো, 'কবে যে মরে যাও সেই ভয়ে থাকি।'

বাচ্চা পেটে এলে গ্রাম থেকে লোকজন এনে ভরে ফেলতো দেখাশোনা করার জন্য। এমন কি বাচ্চা হওয়ার পরেও দুধ খাওয়ানো ছাড়া তেমন কিছু করতে দিতো না। নিজেই যেনো দশ হাতে সব সামলাতো। সেই জন্যেই তো ছেলেমেয়েগুলি এমন মানুষ হলো। পাঁচটা ছেলে তিনটা মেয়ের সবাইকে ভাল অবস্থায় দেখে গিয়েছে।

ছোট ছেলেটা বি কম পাশ করার পর বলেছিল, 'যাক সবগুলো ছেলেকে অন্তত গ্র্যজুয়েট করতে পারলাম। এখন ও এম কমটা করে একটা চাকরি পেলেই শান্তি। কিন্তু সেটুকু আর দেখে যেতে পারলো না বেচারা। ফাইন্যালের রেজাল্টের আগেই স্ট্রোক করে তিনদিনের মাথায় সব শেষ।

লোকে তাকে বলে রত্নগর্ভা। কিন্তু তিনি জানেন সম্পুর্ন কৃতিত্ব ঐ মানুষটির। অমানুষিক কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করেছেন তিনি। শরীর যেন মানুষের নয়। কোনোদিন সর্দি কাশিতে ভুগতে দেখেননি, রাতের ঘুম ছাড়া বিশ্রাম নিতে দেখেননি। অথচ এই মানুষই রিটায়ার করার এক বছরের মধ্যে শেষ। আর তিনি কেমন সুন্দর তারপরেও দিব্যি দশ বছর বেঁচে আছেন।

স্বামী সারাক্ষণ তাকে আগলে রাখতেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া একদিনও বাঁচবেন না ভাবতেন ক্ষীণ স্বাস্থ্যের জন্য। আর এখন সবাই বলে এই স্বাস্থ্যই বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। ক'দিন আগে তার ভাতিঝি লিলি এসেছিল। ওর মা কেমন আছে জিজ্ঞেস করতেই বললো,'আচ্ছা ফুফু আম্মা বয়সে তোমার চার/পাঁচ বছরের ছোট হবে না ?'

উনি হেসে বললেন,'বলিস কি তোর মা আমার এগারো বছরের ছোট।'
লিলি বললো, 'দেখো তো, তুমি কি সুস্থ্য সবল আছো। আর মায়ের যে কি অবস্থা। তিনদিন ধরে বিছানা থেকে উঠতে পারে না।'
মায়ের কথা বলতে বলতে লিলি কাঁদতে লাগলো। কিন্তু তার মৃত্যুর কথা কেউ ভাবে না কারণ তিনি বয়সের আন্দাজে একটু বেশিই সুস্থ্য। এখনও ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের জন্য ছুটোছুটি করে ওদের পছন্দমত পিঠা-পায়েস, নাড়ু-মোয়া ইত্যাদি তৈরী করেন।
সাবিহা বেগম আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন,'শোকর আলহামদুলিল্লাহ। যতদিন বাঁচি যেন নিজের পায়ের উপরই বাঁচি।'
বুকের ব্যথাটা আবার তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। তিনি উঠে দুই ঢোক পানি খান। খালি পেটে পানি খাওয়ায় তার বমি বমি ভাব হয়। তিনি গ্লাসটা রেখে আস্তে আস্তে নীচে নামেন। ছেলেটাকে একবার ডাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ডাকেন না। এমনিতেই বেচারার সারাদিন খাটাখাটনি করে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়।
বরং বকুলকে ডাকবেন ভাবলেন। বকুল তার বড় মেয়ে। এ বাড়িতেই নিচতলায় থাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে। সাবিহা বেগমের শান্ত নিরিবিলি বার্ধক্যে এই মেয়েটি অশান্তি আর দুঃখ দুই-ই নিয়ে এসেছে।
দুঃখ কষ্ট অবশ্য জীবনে কম করেননি তিনি। বরং বলা যায় জন্মের পর থেকে দুঃখ কষ্টই ছিল জীবন। তিন বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে পনের বছর পর্যন্ত চাচার সংসারে কাটিয়েছেন নানা যন্ত্রনায়। তারপর বিয়ে হয়ে চলে আসেন শবশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদে ভরা বিশাল সংসারে।
স্বামী রেলওয়েতে ছোটখাটো চাকরী করতেন। তাছাড়া বাড়িতেও খরচ দিতে হতো। তাই তাকে শহরে নিয়ে যেতে পারেননি। এরই মাঝে রাশেদ, শহীদ আর বকুল হলো । বকুলের চার বছর বয়স তখন, রাশেদ আর শহীদ স্কুলে যায়। এমন সময় খবর এলো ওদের বাবা খুব অসুস্থ । রেলওয়ের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তখন তার শবশুর তাকে নিয়ে এসেছিলেন স্বামীর কর্মক্ষেত্রে। ডাক্তার জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত পরিশ্রম আর ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া না করায় এ অবস্থা। এরপর তার শবশুর নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাদের সংসার গুছিয়ে দেন। ততদিনে অবশ্য দেশের বাড়ির অবস্থাও অনেকটাই ভাল হয়েছে। দেবররা কেউ কেউ কাজ শুরু করেছে ননদদের বিয়ে হয়েছে।
আলাদা সংসারের সাথে সাথে শুরু হলো অন্য রকম যুদ্ধ। শবশুর বাড়িতে থাকতে সংসার কিভাবে চলবে তা ভাবার জন্য মাথার উপরে শবশুর-শাশুড়ী ছিলেন। তাছাড়া সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও ক্ষেত থেকে যে ফসল আসতো তাতে সারা বছরের খোরাকী মজুদ থাকতো। আর নির্ভর করার জন্য ছিল পারা-পরশী, আত্নীয়-স্বজন।
কিন্তু শহরের এই নির্বান্ধব পরিবেশে, একার সংসারে বেতনের সামান্য ক'টা টাকা টীপে টীপে খরচ করেও মাসের পনের/বিশ দিন পর থেকেই শুরু হতো উৎকণ্ঠা। তারমধ্যে ছোট বাচ্চার ঘর, অসুখ বিসুখ বালা মুসিবত তো লেগেই থাকতো।
আরও ছিল এক-দু'বছর পর পর একটি নতুন জন্ম। অভাব অনটন ছিল, তার শরীরও তেমন মজবুত ছিল না। তবু জন্ম নিয়ন্ত্রনের কথা সেকালে সেভাবে ভাবা হয়নি। অভাব অনটন থাকবে, পাশাপাশি নতুন সন্তানও আসবে। সন্তান লালন পালনের জন্য কষ্ট করতে হবে। এ সবই ছিল সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ভাবনা।
যেমন এখন অনেক সুযোগ সুবিধার মধ্যেও জন্ম নিয়ন্ত্রন করাটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটা দু'টোর বেশি বাচ্চাতো এখন কেউই নেয় না। আর এ নিয়েই এখনকার মায়েদের কি ব্যস্ততা, উদ্বেগ, অস্থিরতা।
তার অন্য ছেলেমেয়েরা দিনের পর দিন বাড়িতে আসে না। আসতে বললেই বাচ্চার স্কুল এটা সেটার কথা বলে। মাঝে মাঝে ছেলেরা তাকে দেখতে শুক্রবার সকালে এসে বিকালে চলে যায়। ওরা এলে তিনি তাড়াহুড়া করে সারাদিন খেটে বিভিন্ন খাবার তৈরী করেন। এতেও ওরা বিরক্ত হয় তার কষ্টের কথা ভেবে। অথচ তার কী যে ইচ্ছে করে ছেলে মেয়ে বৌ জামাই নাতি নাতনী সবাইকে এক সংগে বসিয়ে এটা সেটা খাওয়ান; কিন্তু তা আর হয় না।

উনি বুঝতে পারেন না এখনের বাচ্চাদের কি এত লেখাপড়া। তার ছেলেমেয়েরা তো লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিল, সারা কলোনীতে নাম ছিল ওদের। অথচ ওনারা তো ঠিকই বছরে তিন চারবার বার বাড়ি যেতেন। তাও টাকা পয়সার টানাটানির জন্য ইচ্ছে থাকলেও এর বেশি যেতে পারতেন না।

এসব ভাবতে বসলেই যে কত কথা মনে পড়ে। এখন বোঝেন কি অমানুষিক পরিশ্রম করেই যে ছেলেপিলে মানুষ করেছেন। একবার তার দেবর এলো নতুন চাকরী পেয়ে বেড়াতে। এসে তাদের অনটন দেখে একেবারে থ' খেয়ে গিয়েছিল। কখনো বোধহয় ভাবতেও পারেনি কত কষ্ট করে তাদের ভাইজান তাদের জন্য টাকা পাঠায়। তারপর পরামর্শ দিয়েছিল বড় খোকাকে পুলিশে দিয়ে দিতে। সবাইকে কি পড়ানো সম্ভব নাকি। ও একটা কিছু করলে সংসারের ভার একটু তো লাঘব হবে। তার স্বামী এ কথার উত্তরে কিছু বলেননি চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে সাত দিনেও চোখের পানি থামাতে পারেননি। সেই বড়খোকা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। না, তিনি বা তার স্বামী মন ছোট করেননি কখনো।

সাবিহা বেগম আস্তে আস্তে মেয়ের ঘরের দিকে এগোন। বেশ তর্কাতর্কি হচ্ছে ঘরের ভেতর। বড় নাতিটা বোধহয় রাগারাগি করছে মায়ের সাথে। বকুলের চারটা ছেলেমেয়েই তাদের বাবার মত রগচটা হয়েছে। প্রায়ই তিনি দেখেন মায়ের সাথে হৈ চৈ করতে। অবশ্য এখানে তাদের সমস্যাও আছে অনেক। তাই বলে মায়ের সাথে এমন 'তোমার ভাই তোমার ভাই' করে কথা বলবে !

তার আর ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। মেয়েটার কষ্ট হবে। যে সন্তান মায়ের রক্ত পানি খেয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে একদলা মাংসের মত পেট থেকে বের হয়ে অসহায় কান্না জুড়ে দিয়েছিল, সেই সন্তানই মায়ের হাতের তালুর উপর বড় হয়ে, মায়ের অসহায়তা না বুঝলে বুকে বড়ো বাজে। এ কষ্ট কাউকে দেখানো যায় না। ঐ সময়ের সাক্ষী হতে নেই। তিনি আবার ফিরে যেতে লাগলেন।

মেয়েটার ভবিষ্যত ভেবে তার আবার দুঃশ্চিন্তা শুরু হয়। তার মনে হয় মেয়েটার জীবন তারা হাতে ধরে নষ্ট করেছেন। মাত্র সতের বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। ওর তখন মেট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে মাত্র। এর মধ্যে এই বিয়ের প্রস্তাবটা নিয়ে এলেন তার শ্বশুর। তাদের পরিবারটা তখন অভাব অনটনে ধুঁকছে। তবু সাবিহা বেগম রাজী ছিলেন না।

মেয়েটা পড়ালেখায় তার ভাইদের চেয়েও ভাল ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ওকে ডাক্তার বানাবেন। কিন্তু বকুলের বাবা বললো, 'বাবার বয়স হয়েছে, ক'দিন বাঁচবেন। একটা শখ করেছেন। আর পাত্রপক্ষও এত আগ্রহ করে নিতে চাচ্ছে যখন ভালই রাখবে মেয়েটাকে। তাছাড়া ছেলেটাও শিক্ষিত ভদ্র। আমার ছেলেমেয়েদেরও গার্জিয়ান হবে একজন। আর ওরা আমাকে কথা দিয়েছে বিয়ের পরও পড়াবে।'

কিন্তু বিয়ের পর কোন কথাই আর থাকেনি। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে মেয়েটা সংসারে আটকা পড়লো। জামাইটাও যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন না। আর সাবিহা বেগমের নিজেরও তখন সংসার আর শরীরের যা অবস্থা তিনিও পারেননি মেয়েকে কোন সাহায্য করতে। এখন তার সব ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত স্বাবলম্বী হয়েছে,। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। আর এই মেয়েটি স্বামী হারিয়ে চারটা ছেলেমেয়ে নিয়ে এই সংসারে এসে উঠেছে।

জামাইটা মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই দূরে থাক তেমন কোন সঞ্চয়ও রেখে যায়নি। অফিস থেকে কিছু টাকা দিয়েছিল ওই সম্বল।

এতগুলি মানুষ হঠাৎ একটা সংসারে ঢুকে পড়াতে বৌমার কাছে উপদ্রবই মনে হয়েছে। কিন্তু উপায় নেই যখন মুখগোঁজ করে মেনে নিয়েছে। তবে বাড়িটায় সারাক্ষণই একটা অস্বস্তি ছড়িয়েই থাকে। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সোজাসুজি জানিয়ে দেন যে বাড়িটা তার আর সেভাবেই একটা ফয়সালাও করে দেন। কিন্তু সরাসরি কোন কথা না উঠায় উনিও আর কিছু বলে উঠতে পারেননি। আর সংসারের নিয়মেই সংসার ছেলে ছেলেবউকে কর্তা আর তাদেরকে আশ্রিত বানিয়ে নিয়েছে।

সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন মেয়েটার জন্য একটা ব্যবস্থা করার। যেন তিনি না থাকলেও বকুল একটু স্বস্তিতে অন্তত থাকে। সুখ শান্তিতো পেলো না জীবনে।

দোতালায় উঠে হাঁপাতে থাকেন তিনি। ছেলেটাকে ডাকা দরকার কিন্ত বিব্রত লাগে। এমনিতেই বুড়ো হওয়ার পর টুকটাক এটা সেটাতো লেগে থাকেই। তাছাড়া গ্রামের আত্মীয় স্বজন, পাড়ার অসচ্ছল প্রতিবেশী চেম্বারে না গিয়ে সবসময়ই তার কাছে এসে বসে থাকে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করানোর জন্য। ওদের কথাও তাকেই বলতে হয়।

এটাতে ছেলে আর ছেলে বউ দুজনেই খুব বিরক্ত হয়। কিন্তু তিনিই বা কি করবেন। গরীব মানুষজন ডাক্তারকে পয়সা দিতে চায় না সহযে। নইলে ছেলের ভালোর কথা ভেবেই তিনি মানা করতেন। কারণ তিনি দেখেছেন যে এভাবে যারা আসে, তাদের কথা ছেলে মোটেই মনযোগ দিয়ে শোনে না। হাঁটতে হাঁটতে হু হা করে অষুধ লিখে দেয়। তার বুক কাঁপতে থাকে কখন কি অঘটন ঘটে যায় ভেবে। তিনি মনে মনে মুনাজাত ধরেন আল্লাহ তুমি একে সুস্থ্য করে দাও আর আমার অবুঝ ছেলেটাকে মাফ করে দিও।

ঘরে ঢুকে সাবিহা বেগম আবার একটু পানি খেয়ে ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে থাকেন চুপচাপ। আটটা বাজতে চললো। কাজের মেয়েটা বোধহয় আসবে না। বউমাকে ডাকবেন কি না ভাবতে লাগলেন। এলার্ম বাজার পরে উঠে তাড়াহুড়ো লেগে যাবে তখন না আরও রেগে যায়। কিন্তু ভেবে ভেবে সিন্ধান্ত নেয়ার আগেই এলার্ম বেজে ওঠে। বউমা বোধহয় আগেই জেগেছিল বেরিয়ে এসে ঘরের অবস্থা দেখেই মুখ অন্ধকার করে আবার ঢুকে যায়। বসে বসে সাবিহা বেগম শুনতে পান খটাখটি শুরু হয়ে গেছে। নাতনিটা কেঁদে উঠলো জোড়ে.....মারলো বোধহয় .... এখন ওর উপর দিয়েই সব ঝাল মিটবে।

ব্যথাটা বুকে-পিঠে ধরে গেছে। কিন্তু তিনি আর ছেলের ঘরের দিকে এগুলেন না। নিজের ঘরে গিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে থাকেন। বসে বসে তার মনে পড়ে ছেলেটা বের হয়ে গেলে সারাদিনে আর দেখা হবে না। তবু আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারেন না।

গায়ে মৃদু ধাক্কা খেয়ে চোখ মেলে দেখেন বউ মা ডাকছে। বললো,'উঠেন না, উঠে নাস্তা করেন। আর কত ঘুমাবেন। আমি ঝুমকার স্কুলে যাচ্ছি, ওখান থেকে একটু মার্কেটে যাব। সাফা রইল।'

তার ইচ্ছে হলো বলেন সাফাকেও নিয়ে যাও। তা না বলে কাজের মেয়েটা এসেছে কি না জিজ্ঞেস করলেন। আসেনি শুনে ভয় হলো একটু। বউমা বের হলে আর সহযে ফিরবে না।

বললেন,'আজ মার্কেটে না গেলে হয় না ? আমার শরীরটা ভাল না, বুকে পিঠে ধরে আছে আর বমির ভাব.....

বউমা অনেকটা ডাক্তারের ভঙ্গিতেই বলে উঠলো, 'ঐ টা কিছু না। অনেক্ষণ ধরে না খেয়ে আছেন গ্যাস হয়েছে। নাস্তা করে ৩ চামচ ল্যাকটামিল খান ঠিক হয়ে যাবে। আমি যাই দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

একটু পরই বকুল ঢুকল ঘরে। মায়ের শরীর খারাপ দেখে বিছানায় নাস্তা এনে জোর করে একটু খাওয়ালোও। তারপর অষুধ খাইয়ে বুকে পিঠে হালকা করে মালিশ করে দিতে লাগলো। কিন্তু সাবিহা বেগমের ব্যথা বেড়েই চলেছে। সংগে ঘাম শুরু হলো।

মায়ের অবস্থা দেখে বকুল ভয় পেয়ে গেল। বাচ্চাকাচ্চারা সব যে যার মত স্কুল কলেজে চলে গিয়েছে। সে দৌড়ে গেলো শফিককে ফোন করতে। শফিককে পাওয়া যায় না। বকুল রিসেপসানে মেসেজ রেখে আবার মা'র কাছে ছুটে আসে। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে মাকে একটু আরাম দিতে। কিন্তু কষ্টটা উত্তরোত্তর বাড়ছে। তিনি মেয়েকে বললেন, 'সবাইকে ফোন কর।'

বকুল ফোন করতে গিয়ে আবার ফিরে এলো। একটা ফোনও যাচ্ছে না। এন ডব্লিউ ডি লক্ করা বোধহয়। ও কোড জানে না।

সাবিহা বেগম এবার বমি করলেন। বকুল কাঁদতে কাঁদতে আবার দৌড়ে গেল শফিকের খোঁজে। এখান থেকে সেখানে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পাওয়া গেল শফিকের বন্ধু খালেদকে। খালেদ সব শুনে বললো, শফিককে খুঁজে না পেলে ও ই আসছে । একবারে অ্যাম্বুলেন্স নিয়েই আসবে।

সাবিহা বেগম বার বার জানতে চান সবাইকে খবর দেয়া হয়েছে কি না। তাঁর রত্নখচিত সংসারের বলি এই মেয়েটির কাছে অপরাধী মনে হয় নিজেকে। ওর  একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে সময় নেই। তিনি বকুলকে আবার ফোন করতে বলেন।

বকুল মাকে নানাভাবে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আর খালেদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অপেক্ষার সময় বড় দীর্ঘ মনে হয়। নানা কু-চিন্তা ভীড় করে মনের মধ্যে। কিন্তু অসহায়ভাবে কাঁদা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না সে।

বকুল তাকিয়ে থাকে, একটু অক্সিজেনের জন্য যুদ্ধরত মায়ের দিকে। মাকে সে সারাজীবনই  যুদ্ধ করতে দেখেছে। কিন্তু সেই মা ছিল প্রচন্ড তেজী মা। চরম দুর্দশায়ও ভেঙে না পরা মা। অথচ এখন কী অসহায়ভাবে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে।

আত্নীয় স্বজন, পারা-পরশী সবাই মাকে বলে রত্নগর্ভা। তার সাত সাতটি রত্নের মত সন্তান। এর মাঝে একমাত্র সেই হচ্ছে অচল আনির মত। তার দুজন ভাই একজন বোন ডাক্তার অথচ কেউই নেই কাছে। এমনই হয় বোধহয়। রত্ন তো রাজার ঘরের ধন, রাজার কাজেই লাগে। বিধবার আঁচলে থেকে যায় অচল আনি।

# ভালবাসার গল্প

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠলো শ্রেয়সী। এখনো রাজীবের দেখা নেই। পৃথ্বীকে স্কুল থেকে ঠিক সময়ে পিকআপ করলে এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা। অথচ দেখাই নেই। মোবাইলে দুবার ট্রাই করেছে। কথা কিছুই বোঝা যায় না। শুধু এটুকু কোনরকমে বুঝে নিয়েছে যে স্কুলে ঠিক সময়েই পৌঁছেছে সে। পৃথ্বী আছে তার সংগেই।

নির্ঘাত মোবাইলের বেটারী ডাউন। খেয়াল করে চার্জটা পর্যন্ত দেয় না। এই ঢিলেঢালা উদাসীন প্রকৃতির লোকটির ব্যবসায়িক সাফল্য খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয় শ্রেয়সীর কাছে।

হঠাৎ পাশ থেকে 'কেমন আছো' শুনে চমকে উঠে সে। অতি অতি পরিচিত সেই জিজ্ঞাসা শ্রেয়সীর বহুদিনের চর্চায় অর্জিত 'কিছুতেই অবাক না হওয়া ভদ্রমহিলার' শক্ত-সমর্থ অবয়বের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এক মুহূর্ত সন্দেহ হয় তার। সত্যিই কিছু শুনেছে সে নাকি অস্তিত্বের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা কোন জিজ্ঞাসা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে করোটির ভিতরে।

সাবধানে ঘাড় ফেরায় সে। নাহ্ ভুল শোনেনি। এই তো একটু পেছনে প্রায় পাশেই একটু ঝুঁকে দাড়িয়ে আছেন তিনি। না, এবার আর কোন সন্দেহ নেই, তিনিই। অতি পরিচিত ভঙ্গী। কিন্তু এখানে কেন ? তাঁরতো এখানে থাকার কথা নয়। যেখানে যেখানে তাঁর থাকার কথা গত একযুগ ধরে শ্রেয়সী সেসব জায়গা এড়িয়ে চলছে।

শ্রেয়সী তাকিয়েই রইল। সুদর্শন অবয়বে বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট। হওয়ারই কথা অবশ্য। শ্রেয়সীরই পঁয়ত্রিশ। তিনি তো ওর চেয়েও পনের/ ষোল বছরের বড়। কিন্তু শ্রেয়সী দেখছে তাঁর চোখ। সেই উৎসাহে টগবগ ঝকঝকে চোখগুলো এখন কী শান্ত ! শুধু শান্ত নয় কিছুটা যেন ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত।

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সে লক্ষ্য করলো তিনিও মুগ্ধ হয়ে দেখছেন ওকে। মনে পড়লো, ঘুরে তাকানোর তার এ ভঙ্গীটি বড় প্রিয় কবি রেদওয়ান সামসের। শ্রেয়সীর চরম দুঃখের দিনে তার এ ভঙ্গীটি নিয়ে রচনা করা একটি কবিতা 'সেদিন শ্রাবন দিনে' তিনি শুনিয়েছিলেন শ্রেয়সীকে। হ্যা বর্ষা তার প্রিয় ঋতুও বটে।

একবার মনে হলো একটাও কথা না বলে এগিয়ে যায়। কিন্তু তারপরই মনে হলো কেন ? এই মুর্খ লোকটাকে এতটা গুরুত্ব দেয়ার দরকারটা কী ? একটু আশ্চর্যবোধক সুরে যেন এখানে তিনি থাকতেই পারেন না, তাকে একেবারেই মানাচ্ছে না এখানে, এভাবে সে বললো, 'আপনি !'

'হ্যা.. ভালো আছো ?'

'আপনি ?'

তিনি হাসছেন, 'দেখে বোঝনা ? আগেতো বুঝতে'

রাগে শ্রেয়সীর গা জ্বলে যায় (অর্বাচীন, একসময় বুঝতাম শোনাচ্ছে)। তারপর বলে কথাটা তাহলে আপনাকেও ফিরিয়ে দেয়া যায়, আপনিও তো দেখছেন আমাকে। তাছাড়া বিখ্যাত কবি আপনি.... মন নিয়ে কায় কারবার।

'তুমিও স্বনামধন্যা রমনী। প্রায়ই নাম শুনি তোমার '

'স্বনাম ধন্য নই, স্বামীর নামে ধন্য বলতে পারেন।'

'না না সবাই কি পারে। তুমি তোমার মেধার জোরেই এতটা এগিয়েছ।'

শ্রেয়সী তর্ক করে না। আত্মগতভাবে আস্তে আস্তে বলে, 'আমিতো বিখ্যাত হতে চাইনি চেয়েছি শুধু ভালবাসতে। আমি তো একজন কবির স্ত্রীও হতে পারতাম ?'

রেদোয়ানও জবাব দেন না। মনে মনে বললেন, ' অভিমান করে লেখা ছেড়ে না দিলে তুমি বড় কবিও হতে পারতে শ্রেয়সী'

রেদোয়ান স্মিত মুখে তাকিয়ে আছেন, কিছু বলছেন না। তার এই প্রতিক্রিয়াহীন মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রেয়সী আবার নিয়ন্ত্রন হারাতে থাকে। তার ইচ্ছে করে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করে 'কি পারতাম না ? আজ

বলুন কেন পারলাম না।' কিন্তু সে আস্তে আস্তে নিজের উপর নিয়ন্ত্রন ফিরিয়ে আনে। শান্তভাবে বলে 'অনেকদিন পরে দেখা তাই না?'
'হ্যা অ-নে-ক দিন, অনেক মাস, বছর। এক যুগ হবে তাইনা ? মনেই হয় না একই শহরে ছিলাম দুজনেই।'
'হু। দুজনের জগত হয়ে গেছে ভিন্ন। সেখানেই আছেন ?'
'বুঝলাম না'
'বাসার কথা বলছি'
'হ্যা, সেখানেই..... সেভাবেই। বদলায়নি কিছুই।'
'কেন সুযোগ হয়নি, ও সময় পাননি বোধহয় ?'
'কি জানি, সুযোগের কথা ভাবাই হয়নি। কখন যে সময় চলে গেলো.....
কথা শেষ হওয়ার আগেই তীব্র কণ্ঠে শ্রেয়সী বলে ফেল্‌লো 'আপনি কবিতা লিখতে লিখতে বুঝতেই পারলেন না?'
'রেদওয়ান হাসেন। ঠাট্টা করছো নাকি ?'
শ্রেয়সী আবার রেগে উঠে। 'ঠাট্টা কেন হবে সত্যি নয় ? কবিতা ছাড়া কখনই কি কিছু বুঝেছেন ? এমনকি কবিতার মানুষদেরও ? আমার তো সন্দেহ হয় কবিতাও আদৌ আপনাকে ছুঁয়েছে কিনা। নাকি শুধু কথার জাল বোনার নেশায় সুন্দর সুন্দর শব্দ খুঁজেছেন আর জুড়ে গেছেন একের পর এক।'
রেদওয়ান চুপ করে থাকেন। মনে মনে বলেন, সবই ভেবেছি শ্রেয়সী। হয়তো বেশী ভেবেছি বলেই স্বার্থপর হতে পারিনি। আমার কবিতা ভালবেসেছ তুমি মমতাময়ী। কিন্তু আমার জীবনটা তো কবিতা নয় । বরং আমার ক্ষয়িষ্ণু, বিবর্ণ যৌবনের সাথে তোমার কবিতার মত সর্বাঙ্গসুন্দর, ছিমছাম জীবনটা জড়ালে অনেক কষ্ট হতো তোমার ..... সেই অসুন্দরের আর জটিলতার মাঝে আমি কিভাবে তোমাকে টেনে আনতাম।

কবি রেদওয়ান সামস্ যিনি খুবই সপ্রতিভ, সুরসিক এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন। পরিচিত মহলে জনপ্রিয় আড্ডার জন্য কিন্তু বিশেষভাবে খ্যাত খামখেয়ালীপনার জন্য। এ মুহূর্তে কিছুটা কুন্ঠিতভাবে তাকিয়ে আছেন শ্রেয়সীর দিকে।
কেমন বদলে গেছে শ্রেয়সী। তাঁর কেমন যেন ভয় অথবা অস্বস্তি জাতীয় অচেনা একটা অনুভূতি হচ্ছে। আবার সমীহও জেগে উঠছে।
সেই ভীতু ভীতু আর প্রচন্ড কোমল শ্রেয়সী এখন কথা বলছে কি আতবিশবাস নিয়ে ! আগে কি লাজুক ছিল ও! চোখে চোখ ফেলে সরাসরি তাকাতেই পারতো না। আর এখন তার তীব্র চোখে ধারালো চাউনি । যেন ফালি ফালি করে দেখে নিতে চাইছে রেদওয়ানকে।
আগে তিনি শ্রেয়সীর মুখের দিকে তাকালেই হৃদয় পড়তে পারতেন। কিন্তু আজ ও এতো কঠিন কথা বলছে, তীক্ষন ব্যঙ্গ করছে অথচ মুখ একেবারে হাসি হাসি। রেদওয়ান বাজী ধরতে পারেন আশেপাশের একজন মানুষও বুঝতে পারছেনা যে শ্রেয়সী এখন ঝগড়া করছে তার সংগে।
রেদওয়ানের মনে পড়লো শ্রেয়সী ভীষন অভিমানী ছিল। অল্পতেই অভিমান হতো তার। আর চোখ ভরে যেতো জলে। মাঝে মাঝে এ নিয়ে অস্বস্তিতেও পড়তেন তিনি। তার কাছে শ্রেয়সীকে তখন মনে হতো ছিঁচকাঁদুনে। কিন্তু এখন তিনি শতকরা একশ ভাগ বাজি রেখে বলতে পারবেন যে, শ্রেয়সী এখন মোটেই কাঁদেনা।
শ্রেয়সী একটু জোরে বলে উঠলো, 'এই, এই যে কবি, কি ভাবছেন ?'
রেদওয়ান চমকে আশেপাশে তাকালেন। শ্রেয়সী যে তাকেই কবি বলছে অন্যমনস্ক থাকায় বুঝতে একটু সময় লাগলো। তার আবার মনে পড়লো, শ্রেয়সী তাকে ডাকতো 'রৌদ্র'। রেদওয়ান থেকে রোদ তা থেকে রৌদ্র, কখনও সুর্য।

অবশ্য মুখে বলতোনা, তার সমস্ত আবেগ থাকতো চিঠিতে। নাহ্ শ্রেয়সীকে এখন একথা বলা যাবে না। একথা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে কোন কঠিন ব্যঙ্গের সুযোগ করে দেয়া ঠিক হবে না। বোঝাই যাচ্ছে এখন এসব ভাবাবেগের কোন মূল্যই নেই ওর কাছে।
নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি আবার বল্লেন, 'একই শহরে আছি অথচ কতদিন পর দেখা তাই না ? আগে তো সাহিত্য সভা-টভাগুলিতে বেশ যেতে এখন যাওনা বোধহয় ?'
'নাহ্, কত কাজে ব্যস্ত থাকি। কথার ফুলঝুরি ভালো লাগে না আর। আমাদের সম্পর্কটার কোন নাম খুঁজে পেতেন না এখন কি পেয়েছেন ?'
বেফাঁস প্রশ্নটা করেই নিজের উপর রাগ হয় শ্রেয়সীর। প্রথম থেকেই ভেবে রেখেছিল এ সম্পর্কে কোন কথাই সে তুলবে না। বরং তিনি তুল্লে চরম অবহেলা দেখিয়ে অবজ্ঞা করবে। কিন্তু অন্যপক্ষের উদাসীনতায় তার সহিষ্ণুতার বাঁধে চিড় ধরলো।
কিন্তু শ্রেয়সীর যাই মনে হোক রেদওয়ানও সমস্ত সহজতা হারিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। কিছুতেই স্বাভাবিক সতঃস্ফূর্ত থাকতে পারছেন না। শ্রেয়সী যেন তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। তবু তীব্র আকর্ষন কাটিয়ে বিদায়ও নিতে পারছেন না। তার প্রচন্ড ইচ্ছে করছে শ্রেয়সীর হাত দুটো একটু ধরতে, অভিমানে কঠিন ওর মুখ আদরে আদরে কোমল করে তুলতে। কিন্তু তার মনে হলো শ্রেয়সীর সাথে তার এখন যোজন যোজন দূরত্ব। শ্রেয়সী একটি স্থির বিশবাস নিয়ে বসে আছে যে, সে প্রতারিত হয়েছে। তিনি ওকে ভালবাসেননি ।

তিনি তবু নিজের স্মার্টনেস বজায় রাখার চেষ্টায় হাসলেন। তারপর বললেন,'নাহ্ এখনও বুঝতে পারিনা। কখনও মনে হয় বন্ধুত্ব। কিন্তু বন্ধুত্বের সীমাতো আমরা মানিনি। আর বন্ধুত্বে কি এতো তীব্র আকর্ষন অথচ প্রচন্ড অভিমান, এতো অধিকারবোধ আর বিচ্ছিন্নতা পাশাপাশি থাকে ! তখন মনে হয় প্রেম। কিন্তু প্রেমের যে সর্বগ্রাসী ভাঙন, সত্যকে অকপটে স্বীকার করে পরিনতির দিকে এগিয়ে যাওয়া তা কেন পারলাম না আমরা ?'
'পারলেন না ! পারার কথা ভেবেছিলেন নাকি ? আর আমরা মানেটা কী ? আমাকে কেন জড়াচ্ছেন ? এখনও একা কোন দায়িত্ব নেয়ার মত সামর্থ হয়নি ?'
রেদওয়ান হঠাৎই দেখলেন শ্রেয়সীর মুখটা বদলে যাচ্ছে। চোখের কোণে জল। সে মুখ নীচু করে একটুক্ষণ দাড়িয়ে রইল। তারপর ব্যাগ খুলে সানগ্লাস বের করে একটা হাত উপরে তুললো। একটা গাড়ি এসে থেমেছে সামনের রাস্তায়। দরজা খুলে বের হচ্ছে শ্রেয়সীর স্বামী। শ্রেয়সী এগুতে এগুতে হাতের কাগজটা এগিয়ে দিলো রেদওয়ানের দিকে।
আস্তে বললো, 'আমার মাঝে মাঝে মনে হয় শুধুমাত্র কষ্ট পাওয়ার জন্যেই আপনার সংগে আমার দেখা হয়েছিল আর কিছুনা। তবু আমার কোন দুঃখ নেই, কোন অভিযোগ নেই। আমি হয়তো ভুল মানুষকে ভালবেসেছি। কিন্তু আমার ভালবাসাটা তো সত্য। আর ভালবাসার অনুভবটাও তো কম বড় পাওয়া নয়।'
রেদওয়ান কাগজটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন শ্রেয়সীর ভিজিটিং কার্ড। শুধু ঠিকানার অভাবে যে শ্রেয়সীর সাথে যোগাযোগ করা যায়নি তা নয়। তার ঠিকানা জোগাড় করা কঠিন কিছুই নয়। নামী দামী অফিস তার। ইচ্ছে করলেই যোগাযোগ করা যেতো। শ্রেয়সীও তা জানে। কিন্তু গত একযুগে তা করা হয়নি, শ্রেয়সীর অভিমান ভাঙাতে চাননি তিনি।
আর তার তো সবই শ্রেয়সীর জানা। অথচ কখনও যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেনি। তীব্র অভিমান আর বিচ্ছিন্নতা নিয়ে দূরে সরে থেকেছে। তবে এখন কেন হঠাৎ ভিজিটিং কার্ড ? তবে কি শ্রেয়সী চাচ্ছে.....
রেদওয়ান দেখলেন শ্রেয়সী হেঁটে হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
নিজেকে হঠাৎ খুব একা আর গরীব মনে হয় তার। আজ মনে হচ্ছে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভালবাসাহীন এ কোন জীবনের হিসাব নিকাশ তিনি করেছেন ! জীবনের সৌন্দর্য আর সাফল্যের কথা বিবেচনা করতে গিয়ে ভালবাসাকে ব্যার্থ করলেন তিনি । কিন্তু..... আজ তিনি সম্পুর্ন নিঃস্ব, আর শ্রেয়সী

তার সফল ভরভরন্ত জীবন নিয়েও হাহাকার করছে। তার ইচ্ছে করলো দৌড়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরেন। একযুগ আগে যে ভুল হয়েছিল আজ তা শুধরে নেন।
কিন্তু তিনি স্থির দাড়িয়ে রইলেন। দেখতে লাগলেন শ্রেয়সী একবারও পেছনে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। হঠাৎ তার মাথায় কয়েকটি পংক্তি ঘুরতে লাগলো-
পার্লারে বাঁধা আধুনিক খোঁপা
চিঁকণ শাড়ী আর জড়োয়া গহনায়
ঝলমল করতে করতে[] .....

সেই উদ্ধত বঙ্কিম ভঙ্গি,
সেই ধনুক বাঁকা ভ্রূ
ঢেউ এর মতন তোমার অস্তিত্ব.....

শ্রেয়সী কি কবি কবি বলে ঠাট্টা করছিল তাকে ? কিন্তু কবিতাকে তিনি পেলেন কোথায়। শ্রেয়সীকে হারিয়ে কবিতাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন, অথবা শ্রেয়সী যেমন বলে কবিতার জন্যেই মনযোগ দেননি ওর দিকে। কিন্তু শ্রেয়সীর সাথে সাথে কবিতাও তো পর হয়ে গেল।
আবার কয়েকটি পংক্তি মনে এলো। কাব্যলক্ষ্মী কি তাহলে ধরা দিচ্ছে আবার! মনে মনে আওরাতে লাগলেন-
বয়সের চাদর কাম-প্রেম, ইচ্ছা-অনিচ্ছা
সব কিছুকেই করে ফেলে
বড্ড সামাজিক।
তবু এই রোদেলা দুপুরে-
তুমি একবার মাত্র ডাকলে,
একটিবার হাত বাড়ালে
তোমার জন্য, শুধু তোমারই জন্য
আমি আবার হতাম উদ্ধত সবুজ বালক.....

কয়েকদিন পরে একটি চিঠি পেলেন। নীল চিঠি নয়, হলুদ অফিসিয়াল খাম। শুধু প্রাপকের নাম ঠিকানা লেখা, প্রেরকের পরিচয় নেই। কিন্তু খুলতেই ভেতরে সেই সুগন্ধমাখানো কাগজ। প্রতি নেই ইতি নেই- লেখার সেই পুরোনো ভংগী।

আরেকটা জীবন চাই
- যাপনের জন্য।
কত কী চাওয়ার ছিল
কত কী পাওয়ার ছিল
হয়নি কিছুই।
একটা জীবন ভেবেছিলাম
কেটে যাবে কবি আর কবিতা নিয়ে
হলো না তাও।
কবির মধ্যেই বাস অ-কবির
বুঝতে বুঝতে গেলো
একটা পুরো-জীবন।

# অপনোদন

অদ্রি আরেকবার ঘড়ি দেখল। দু'টা চল্লিশ বাজে। থাকলে এতক্ষণে চলে আসার কথা। প্রতিদিনই দেড়টা থেকে দুটার মধ্যে চলে আসে আজই এত দেরী হচ্ছে। সে চলে যাবে চলে যাবে ভেবেও আবার দাঁড়ালো। নইলে ফিরে গিয়ে সারাদিনই মনে হবে আরেকটু দাঁড়ালেই হয়তো দেখা পেতো, হয়তো আজ কথা বলার একটা সুযোগ হতো।

মেয়েটি প্রতিদিনই দেড়টা থেকে দুটার মধ্যে এদিক দিয়ে যায়। কিন্তু সবসময়ই সংগে একদঙ্গল বন্ধুবান্ধব থাকে তাই আর ডাকা হয় না। একজন অপরিচিত লোক একটি ২৩/২৪ বছরের মেয়েকে ডেকে কথা বলতে চাইলে এই রক্ষনশীল শহরে ঝামেলা তৈরী হবেই। বাংলাদেশের মেয়েরা এখনও ততটা আত্নবিশবাসী হতে পারেনি আর তাদের বন্ধুরাও নিজেদেরকে বান্ধবীদের লোকালগার্জেন ভাবে। তাই সে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করে।

একদিন অবশ্য একটা সুযোগ এসেছিল। সেদিন মেয়েটি একা ছিল কিন্তু পরিস্থিতিটা এমনই হয়ে গেল যে হাজার চেষ্টা করেও গলা থেকে আওয়াজ বের করতে পারেনি।

তখন সবে ৩-৪ দিন হয়েছে অদ্রি এখানে এসে দাড়াচ্ছে। প্রতিদিন সে একটার দিকে লাঞ্চের জন্য বের হয়ে এখানে চলে আসে। এসে মিনিট দশেক হাঁটাচলা করে ধাতস্থ হতে হতেই মেয়েটি রাস্তা পার হয়। কিন্তু সেদিন গাড়ী থেকেই দেখল মেয়েটি হন্ হন্ করে হেঁটে আসছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী পার্ক করে এগুতে শুরু করেছে, এমন সময় পেছন থেকে একটি ছেলে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো 'কালি এই কালি নোটগুলো শেষ হয়েছে নিয়ে যাস'। মেয়েটি পেছন ফিরে 'আচ্ছা' বা 'ঠিক আছে' জাতীয় একটি ইশারা করেই আরও দ্রূত হাঁটতে শুরু করলো। অদ্রি কিছুতেই ভাবতে পারলোনা এ রকম সুন্দরী একটি মেয়েকে সে কালি বলে কিভাবে সম্বোধন করবে। আবার এইমাত্র নামটি শোনার পর ভাববাচ্যে ডাকাও সম্ভব হলোনা। এরই মধ্যে মেয়েটি লাফ দিয়ে একটি স্কুটার ধরে চলে গেলো।

অদ্রি বারবার নামটি আওড়াতে লাগলো। সে ভেবে পাচ্ছেনা বাবা মা কিভাবে সন্তানের নাম কালি রাখতে পারে। কুসংস্কার কি ? হতে পারে । খুব সুন্দরী মেয়ের ক্ষেত্রে বাবা মার মধ্যে বিভিন্ন সংস্কার কাজ করে ।

তার ছোট আপার যখন প্রচণ্ড সুন্দর একটা মেয়ে হলো, আপা শখ করে তার নাম রাখলো পরী। কিন্তু আপার শ্বশুরবাড়ির কেউ সে নাম পছন্দ করলোনা। আপার শাশুড়ী বল্লেন ' কেমন মা সন্তানের ভাল মন্দের চিন্তা নাই, নিজের মেয়ের নাম রাখলো পরী'।

তাঁরা পরীর নাম রাখলেন মেহ্রীন। কিন্তু সাহিত্য পাগল আপা কিছুতেই মেহ্রীন ডাকলোনা এবং তিন বছর বয়সে পরী যখন প্রবল জ্বরে তিন দিনের মাথায় হুট করে মারা গেল; যখন তীব্র শোকে আপা পাথর, সে সময় সেই বাড়িতে অদ্রি এই নামের ব্যাপারে বলাবলি হতে শুনেছে ' সুন্দর বাচ্চাদের দিকে এমনিই খারাপ নজর থাকে। তাই পরী নাম রাখলে সুযোগ বুঝে তুলে নেয়।' কে নেয় তা উহ্য, সম্ভবত সবাই জানে।

যাক, তবু নামটা জানা গেল ভেবে স্বস্তি লাগলো তার। কিন্তু তারপরও প্রায় দু সপ্তাহ কেটে গেল। এরমধ্যে সে বেশকবারই এখানে এসে ঘুরাঘুরি করেছে, কিন্তু কার সংগে কথা বলবে, কিভাবে খোঁজ করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

একমাস আগে বিশববিদ্যালয় এলাকায় সে ঢুকেছিল ছোটবোনের পাত্র দেখতে। সেদিনই এই মেয়েটিকে দেখে। এই মেয়েটি অনেকদিন পর তাকে লুবিনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

ম্যাক্সিকান মেয়ে লুবিন, যে তাকে ডাকতো অড্রে। একজন মানুষের সংগে আরেকজন মানুষের চেহারা এতো অদ্ভুতভাবে কিভাবে মিলে যায় অদ্রি জানেনা। কিন্তু তার বড়ো জানতে ইচ্ছে করে একই চেহারার দুজন মানুষের মনও একই হয় কিনা।

জার্মানীতে এক বছরের একটা স্কলারশীপ নিয়ে পড়তে গিয়ে লুবিনের সংগে পরিচয়। দুজনেই ছিল এম এস প্রোগ্রামের একই বিভাগের একই গ্রুপের ছাত্র। প্রথম পরিচয়ের দিন অদ্রি বাংলাদেশ থেকে এসেছে শুনে লুবিন একটু অবাক হয়ে বলেছিল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি ফিলিপাইন থেকে এসেছ'।
অদ্রি পাল্টা প্রশ্ন করেছিল 'কেন' ?
লুবিন বল্লো, 'আসলে রাইস রিসার্চে ফিলিপাইনের ছাত্র বেশী থাকে, তাছাড়া তোমার চেহারা দেখেও মনে হয়েছিল। কারন আমার ধারনা ছিল বাংলাদেশের মানুষ বুঝি কালো'।
অদ্রি শব্দ করে হেসে উঠায় লুবিন খুব অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল। বার বার 'সরি' বলছিল, আর বলছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কথা।
তাকে সহজ করার জন্যে অদ্রি বলেছিল, 'চল এককাপ কফি খেতে খেতে বাংলাদেশ সম্পর্কে কথা বলি। অবশ্য তুমি যদি বিরক্ত না হও'।
লুবিন সম্ভবত তার অস্বস্তি কাটিয়ে উঠার জন্যই অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে সংগে সংগে হাঁটতে শুরু করেছিল। সেই থেকে বন্ধুত্বের শুরু। অদ্রি অবাক হয়েছিল লুবিনের ম্যচিওরড ব্যবহারে। সব সময় হাসিখুশী, প্রতিক্রিয়ায় অতিনাটকীয়তা নেই, সব আলোচনাতেই সাগ্রহে অংশগ্রহন করছে অথচ প্রগলভতা নেই; একটা মেয়ে তার আচরণে এতটা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, এত সুন্দর ব্যাক্তিত্ব অর্জন করতে পারে, অদ্রি সেই প্রথম অনুভব করলো ।
অদ্রি প্রতিদিনই একটু একটু করে মুগ্ধ হতে লাগল। লুবিন প্রায়ই অদ্রির কাছে আসতো বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে বুঝে নিতে এবং একসংগে পড়াশুনা করতে। অদ্রি যখন বুঝাতো সে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকতো আর হঠাৎ হঠাৎ বলে উঠতো, 'তোমার কনসেপ্টতো খুব ভালো, তুমি খুব ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে'।
লুবিনের কথায় অদ্রির মনেও ভালোলাগা আর উচ্চাশা ভর করেছিল। সে লুবিনের গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল,'তারচেয়ে আমি যদি কবি হতাম তোমার চোখ নিয়ে লিখতাম একশ একটি কবিতা'।
লুবিন খুশী হয়েছিল, পাশাপাশি কৌতুহলীও হয়েছিল। জানতে চেয়েছিল 'একশ একটি কেন, কেন একশটি নয় অথবা একশ দুটি'। তাকে তখন বাংলাদেশের পূর্ণসংখ্যার সাথে এক যোগ করার উপকথা শোনাতে হয়েছে। লুবিন চুপচাপ অদ্রির কথা শুনতে শুনতে ভারতীয় মিথলজী সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে।
অদ্রিকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয় যে এ ব্যাপারে তার জ্ঞান খুবই সীমিত। আসলে এ দিকটায় সে কখনই তেমন আগ্রহ বোধ করেনি। সে হাসতে হাসতে বলে, 'তবে এখানে এসে তোমার সংগে দেখা হবে জানলে আমি নিশ্চয় আসার আগে এ বিষয়ে অনেক লেখাপড়া করে আসতাম।'
লুবিনও হাসে বলে ' এটা খুব খারাপ যে আমি তোমার সব কথাতেই অনবরত প্রশ্ন করছি, আমি বোধহয় একটু বেশী কৌতুহলী তুমি নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছো?'
অদ্রি মনে মনে বল্ল ধন্য হচ্ছি সুন্দরী ধন্য হচ্ছি। কিন্তু মুখে অবাক হওয়ার ভান করে বল্লো, 'বিরক্ত হবো কেন ?'
লুবিন বল্ল, 'অনেকেই হয়, কথার মাঝে প্রশ্ন করলে অনেক ছেলেরই ইগো হার্ট হয়।'

দিনগুলো যেন নেচে বেড়াতে লাগলো। প্রতিটি দিনই এত সুন্দর, এত অর্থময়, এত আনন্দময়। অদ্রি প্রতিদিনই নতুন করে লুবিনকে আবিস্কার করতে লাগল। তাকে নারী হিসেবে যতটা আকর্ষনীয় মনে হয়, কাছে পেতে ইচ্ছে করে ততটাই ভাল লাগে বন্ধু হিসেবে, সহযোগী হিসেবে। যে কোন তুচ্ছ বিষয়ও ওর সংগে আলাপ করতে ইচ্ছে করে, আর ভাল লাগে নির্ভর করতে।
অদ্রি যদিও প্রচলিত অর্থে লুবিনের সংগে প্রেম করছেনা। তবু এই প্রচ্ছন্ন ভাললাগা তাকে অনেকটাই বদলে দিলো। সে প্রচন্ড ভাল রেজাল্ট করতে লাগলো। সারাক্ষণই যেন আনন্দে টগবগ করছে। সবার সংগে মিশছে, সবার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, দেশ থেকে নতুন ছাত্র এলে তাদের দেখাশোনার ভার

নিচ্ছে। এমনকি বিদেশী ছাত্ররাও লেখাপড়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনেও তার সংগে আলোচনা করে। ইনিস্টিটিউটে সে প্রায় হিরো হয়ে গেল।

পাশাপাশি বাড়ীর সবার জন্যেও অন্যরকম এক মমতায় ভরে উঠে মন। জীবনে প্রথমবারের মত সে বাড়ীতে চিঠি লিখতে শুরু করলো। হলে যখন থাকতো প্রত্যেকবারই ফিরে যাওয়ার সময় মা বারবার বলে দিতেন 'পৌঁছেই চিঠি দিস' কিন্তু সে কথা কোনদিনই সে পালন করতে পারেনি। হয় আজ লিখব কাল লিখব করে লেখা হয়নি অথবা লিখতে বসেও শেষ করা হয়নি কথা খুঁজে না পেয়ে। আর এখন যেন কথার অফুরন্ত ভান্ডার তার কাছে। এক পাতা দু' পাতায় কথা ফুরায় না। দুদিন না যেতেই আবার লম্বা চিঠি লেখে।

অদ্রি নিজেই অবাক হয় নিজের আচরণে । আগে কি তাহলে বাড়ীর জন্য ভালবাসা কম ছিল ? আবার নিজেই নিজেকে যুক্তি দেয় না, ভালবাসা কম ছিল না কম যা ছিল তা হচ্ছে আনন্দকে নিবিড় করে অনুভব করার ও সচ্ছন্দে প্রকাশ করার মত মুক্ত পরিবেশ। জীবন কি কখনও এত সহজ এত জটিলতাহীন ছিল ? বরং উল্টো আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে নানারকম দ্বন্দ্ব, অবদমন, আর কঠোর বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে বড় হতে হতে মনটাই গুটিয়ে যায়। বেশিরভাগ মানুষ আর সম্পর্কগুলো যান্ত্রিক হয়ে যায়। বাবা,মা, ভাই-বোনদের সাথেও আবেগ প্রকাশে সংকোচ এসে যায়। এখানে না এলে হয়তো শৃ[] খলিত জীবনের এই নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার কথা অজানাই থেকে যেতো।

চোখের পলকেই আটটি মাস কেটে গেল। আর দু মাস পর ফিল্ডওয়ার্কে থাইল্যান্ড যেতে হবে। এজন্য এ দুমাস তাদেরকে নাওয়া খাওয়া ভুলে প্রস্তুতিমূলক পড়াশুনা এবং কাজ করতে হচ্ছে। অদ্রি, লুবিন, শ্রীলংকার সামারা সাকেরা আর ভিয়েতনামের বীন এক গ্র[] পে। কাজের পরে প্রায়ই চারজনে মিলে আলোচনা করে। মাঝে মাঝে ডিনার শেষ করে লুবিন আসে পড়াশুনা করতে, পড়তে পড়তে প্রায়ই অনেক রাত হয়ে যায়.... অদ্রির ইচ্ছে করে আজ বিশেষ কথাটি বলবে আবার নিজেই বাদ দেয়। মনে হয় নাহ্ এ পরিবেশে এ কথা মানায় না বরং আরেকটু সময় যাক্। থাইল্যান্ডে গিয়ে বরং বেড়াতে বেড়াতে বলা যাবে।

থাইল্যান্ড যাওয়ার কয়েকদিন আগে কাজ করতে করতে সামারা সাকেরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো 'তুমি কি পি, এইচ, ডির ব্যাপারে ডীনের সংগে কথা বলেছিলে ?

ডিরেক্টলি কিছু বলিনি, তবে কী কী ক্রাইটেরিয়া ফুল্‌ফিল্ করতে হবে প্লাস সম্ভাবনা কতটুকু তাই জানতে চেয়েছিলাম।'

'উনি কি বল্‌লেন' ?

'অনেক কিছুই বল্‌লেন। কোটার কথা তাছাড়া ফান্ড এভেইলেবল না তাই যারা ফান্ড ম্যানেজ করতে পারবে তারাই প্রেফারেন্স পাবে' এসব আর কী।

'ইনিস্টিটিউটের ফান্ড তো একটাই। মিঃ লুকাস বেক করছেতো লুবিনই ওটা পেয়ে যাবে'।

'তাই নাকি? কই লুবিন কিছু বলেনিতো'!

'বলার মতো এখনওতো কিছু হয়নি। তবে হবে যে তা সবাই জানে, এমনি এমনি নিশ্চয়ই সে ষাট বছরের বৃদ্ধের পকেটে ঢোকেনি।'

অদ্রির নিঃশবাস বন্ধ হয়ে এলো, সামারা এভাবে কথা বলছে কেন? ও ঠিক কি বলতে চাইছে ? ওর কথার স্টাইলে মনে হচ্ছে ও ধরে রেখেছে অদ্রিও সব জানে। কিন্তু অদ্রিতো কিছুই জানে না, কতটুকু জানতে হবে ওকে ?

অদ্রি সাবধানে বললো, 'এভাবে বলছো কেন '?

সামারা বললো,'আমিও ততোটা জানতাম না। ইন্টারন্যাশনাল ডে তে আমি সারারাত আফ্রিকানদের সংগে ড্রিংক করেছিলাম। ওদের কাছেই ডিটেইল শুনলাম। আব্রাহাম সব জানে। ওই বললো, লুকাস ডিভোর্সড, লুবিন প্রায়ই তার বাসায় যায়। আর মূলত এ কারণেই লুকাস নিজে আগ্রহ করে থাইল্যান্ড যাচ্ছেন। নইলে তিনি সাধারণত যেতে চাননা, গত কয়েক বছরে যাননি। ডিপার্টমেন্টের টীচাররাও বিষয়টা জানেন।

একটু থেমে সামারা আবার বললো,' তাছাড়া লুবিন আমার ভালো বন্ধু। আমি জানি সে খুবই উচ্চাকা[] খী। এত কষ্ট করছে, ভাল রেজাল্ট করছে। আমি জানি সে কোনভাবেই এ সুযোগটা হারাতে চাইবে না।

অদ্রি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। সে স্থির চোখে তাকিয়েছিল সামারার দিকে। তার মুখ থেকে সব রক্ত কি সরে গিয়েছিল ? সে জানেনা। সামারা কি কিছু আঁচ করেছে ? এমনভাবে তাকিয়ে আছে কেন ?
সামারা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,'সরি অদ্রি, আমি শুধু তোমার বন্ধু নই ভক্তও। আমি জানি তুমি ব্রিলিয়ান্ট, আকর্ষনীয় কিন্তু লুকাস ক্ষমতাবান।
তারপর শুধুই দেখে যাওয়া। প্রেম সম্ভবত মানুষকে অন্ধই করে নইলে সবাই দেখলো, শুনলো, জানলো শুধু সেই রয়ে গেল অজ্ঞ !
একসময় এম, এস শেষ করে অদ্রিকে ফিরতে হলো ঢাকায়, লুবিন রয়ে গেল পি, এইচ, ডি করতে।
মাঝে মাঝে অদ্রির সারারাত ঘুম হয়না। তীব্র আলস্যে সারাদিন শুয়ে থাকে, খাওয়া দাওয়া করে না। মা প্রায়ই বিয়ের কথা বলেন। মা কি সব বুঝতে পারেন দু' এক সময় চিঠির সুত্র ধরে লুবিনের কথা জানতে চান। এর মধ্যে ছোট বোনটারও বিয়ে হয়ে গেল।

অদ্রির বুকের ভিতর ড্রাম বেজে উঠে। মেয়েটি আসছে, একেবারে একা। দুপদাপ পা ফেলে এগুচ্ছে। কেমন ব্যস্ত ভঙ্গী।
সে কি খুব ব্যস্ত না তার স্টাইলটাই এমন। অদ্রি বিপন্নবোধ করতে থাকে, একজন ব্যস্ত মানুষকে পিছু ডাকতে খারাপ লাগে। মনে হয় তাকে বিরক্ত করছি, বোধহয় তার দেরী করিয়ে দিলাম।
তবু মেয়েটি এগিয়ে যেতে সে বলে উঠল, 'এই যে'।
মেয়েটি বোধহয় বুঝতে পারেনি এগিয়েই যাচ্ছে। অদ্রি খানিকটা চেঁচিয়ে উঠল 'এই যে ....কালি'।
মেয়েটি চমকে পিছন ফিরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করলো 'আপনি কি আমাকে ডাকলেন ?
'জ্বী'
'আমার নাম কিভাবে জানলেন'?
জ্বী আপনার বন্ধুকে ডাকতে শুনেছি।
মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠেই নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করতে লাগলো।
কিন্তু অদ্রি লক্ষ্য করলো তার শরীর হাসির দমকে ঢেউ হয়ে ভেঙে পরতে চাইছে এবং পরক্ষণেই অদ্রিকে চরম বিব্রত করে বাধভাঙা হাসি ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল।
মেয়েটির চোখ হাসছে, মুখ হাসছে সমস্ত শরীর হাসছে।
অদ্রি আপাদমস্তক কেঁপে উঠল।

এ এক বিচিত্র মেয়ে। কোন ক্লান্তি নেই, সারাক্ষণই টগবগ করছে। ঝট করে রেগে যাবে আবার পরমূহুর্তেই হাসবে। কথা শোনার চাইতে বলবে বেশী। আর মাঝখানে কিছু বলতে গেলে ধমকে দেবে।
প্রচণ্ড সময় সচেতন। অদ্রির একদিন পৌঁছতে পাঁচ মিনিট দেরী হয়েছে, সে ফিরে গেল। অদ্রির রাগ হয়েছিল। পরে বলেছিল মাত্র পাঁচ মিনিট দেরীর জন্য শাস্তিটা বেশী হয়ে গিয়েছে।
কিন্তু সে সরি বলা দূরে থাক উল্টে বললো, 'আপনি আমার জন্য আধঘন্টা আগে আসতে পারেন কিন্তু একমিনিট পরেও নয়।'
ও যে কখন কি করবে তা ভেবেই অদ্রি তটস্থ হয়ে থাকে। একদিন হঠাৎ হাজির হয়েছিলো অফিসে। কি বিপদে যে পড়েছিল সেদিন।
আবার নাম বলা নিয়ে কত কান্ড। অদ্রি যতই নাম জানতে চায় সে কিছুই বলে না। অদ্রিও একদিন রাগ করে বললো,'বেশ আমিও কালিই ডাকবো তাহলে'।
আর যায় কোথায়। শুরু হলো হাসি। তারপর বললো, 'বেশ ডাকবেন আমিও আপনার বোকামির গল্পটা সবাইকে বলে দেবো।'
ব্যাস, অদ্রি চুপ। না, ও আর সেই বিব্রতকর অবস্থা মনে করতে চায় না।

হঠাৎ অফিসে 'অদ্রি' নামে একটা চিঠি এলো। ও একটু অবাক হলো। ব্যাক্তিগত চিঠি সাধারনত বাসায়ই আসে। আর অফিসিয়াল চিঠিতে ভালো নাম লেখা থাকে। অদ্রি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল, সম্ভবত এরকম হস্তাক্ষরকেই মুক্তোর মত লেখা বলে।

সুজনেষু,

আমাকে চিনবেন না। তবে আমি যেভাবেই হোক আপনাকে জেনেছি। আমি আপনার অফিসের কাছাকাছিই থাকি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই তাই অন্য উপায় না থাকায় এভাবেই লিখতে হলো।

যদি কিছুমাত্র আগ্রহবোধ করেন, তাহলে আগামীকাল অফিস শেষ করে চৌরাস্তায় পুলিশ বক্সের সামনে দাড়াবেন। আমি সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আপনাকে খুঁজে নেবো। আমার পরনে থাকবে নীল পোশাক।

মৃদু।

অদ্রি কয়েকবার পড়লো চিঠিটা। মনে করার চেষ্টা করলো অফিসের কাছাকাছি তেমন কাউকে দেখেছে কিনা, মনে পড়লোনা।

সে উত্তেজিত বোধ করতে লাগলো যাবে নাকি যাবে না। একবার মনে হলো, না যাওয়ারতো কিছু নেই। অতি সাধারণ একটা ব্যাপার । অন্য কোথাওতো যেতে হচ্ছেনা। অফিসের রাস্তায় কিছুক্ষণ না হয় দাড়ালোই। এতো সুন্দর যার হাতের লেখা, তাকে দেখতে কেমন তাও দেখা হলো। কিন্তু পাশাপাশি সুক্ষন একটা অস্বস্তি তাকে সংকুচিত করে ফেললো। তার বারবারই মনে হতে লাগল কি দরকার ঝামেলায় জড়ানোর। বিভিন্ন রকম সন্দেহে দুলতে লাগলো মন।

পরদিন অফিসে বসেও সে যাব যাবনা লটারি করতে লাগলো। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগেই এলো ফোন। ওপাশ থেকে তখনও নাম না জানা কালি বললো, 'অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে পারবেন ?'

'কেন ?'

'খুব দরকার দেখা হলেই বলবো'

'ক'টায়' ?

'ঠিক পাঁটটায়। আমি আগের জায়গায় থাকব।'

'আচ্ছা।'

অদ্রি হিসেব করতে থাকে পাঁটটায় মানে অফিস থেকে বের হতে হবে পনের মিনিট আগে। তাহলে সেখানে যাওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকলোনা। সিদ্ধান্তহীনতা যদিও কাটলো, তবু একটু মন খারাপ লাগছে।..... এতো সুন্দর যার হাতের লেখা.....

অদ্রি কালির কথাও ভাবলো। ওদের এখনও তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কি এমন সমস্যা নিয়ে সে আসতে পারে। ও এমন ঝড়ের বেগে কথা শেষ করলো যে অদ্রি উল্টে কিছু জিজ্ঞেসই করতে পারেনি।

তবু নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিক সময়েই পৌঁছলো সে। নইলে আবার আরেকদিনের মতোই ঘটবে হয়তো। অদ্রি নিজে নিজেই বিভিন্ন সমস্যা ভাবতে ভাবতে পায়চারী করতে লাগলো। আর ও আসতেই একটু উত্তেজিতভাইে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে'?

কিন্তু তার কোন ভাবান্তরই নেই। উল্টে বললো 'কি হবে '?

'না ফোনে বললে দেখা হলে কিছু বলবে, ... দরকারী।'

'আমি নিজে থেকে দেখা করতে চাইলাম আর আপনি জিজ্ঞেস করলেন -কেন'!

অদ্রি এ রকম উত্তরের জন্য একেবারেই তৈরী ছিল না। বিব্রত হয়ে বললো, 'সে জন্যেই তো জিজ্ঞেস করলাম তুমি তো নিজে থেকে কখনও বলো না।'

'উত্তরে ও শুধুই হাসলো'।

অদ্রির অস্বস্তি শুরু হলো। কথাটা আসলে ঠিক বলেনি। বরং ও যেহেতু নাম বা ঠিকানা কিছুই দেয়নি তাই নিজেই বেশী যোগাযোগ করে।
কথা তেমন জমছিল না। হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'আপনাকে আপসেট মনে হচ্ছে'।
অদ্রি প্রানপণে অস্বীকার করলো। তবে মনে মনে বললো, তেমন কোন দরকার যখন নেই-ই তবে আজই কেন....আর কিছু না হোক ....অন্তত এত সুন্দর লেখা যার....
'সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলো।'
অদ্রি আবার চমকে উঠল 'মানে'?
'মানে আপনি অতীব অন্যমনস্ক হয়ে আছেন'।
'এটা ঠিক নয়'।
এটাই ঠিক'।
'মোটেও না'
'আমি কিন্তু প্রমান দিতে পারি'।
'দেয়া হোক'।
'আমি যে নতুন ড্রেস পরেছি, আপনি খেয়ালই করেননি'।
'করেছি'।
'কিছু বললেন্ না তো'।
'পরে বলতাম'।
'না বলতেন না। কারন মৃদুর সংগে দেখা হলোনা বলে আপনি রেগে গেছেন। ড্রেসটা নীল তাও চোখে পরেনি আপনার' ।
'মানে'?
'জ্বী। মানে যা ভাবছেন তাই'।
'সত্যি ?'
'আজ্ঞে হ্যা'।
'মাই গড তোমার ড্রেসটা তো নীল-ই। আমি আসলে নীল পোষাক বলতে নীল শাড়ী ভেবেছিলাম'।
'স্বাভাবিক বাঙ্গালী ছেলে বলে কথা'।
'এই আমি কিন্তু মোটেই টিপিক্যাল নই'।
'বোঝাই যাচ্ছে'।
আসলে এই ছলবলে মেয়ের লেখা যে এত সুন্দর হতে পারে অদ্রির মনেই হয়নি। কেমন যেন মেলাতে পারলোনা। তবে মুখে কিছু বললোনা। তাহলেই আবার প্রি-কনসেপ্টের খোঁটা শুনতে হবে।
এই একদিনেই তারা যেনো অনেক কাছাকাছি চলে এলো। একটি নাম তাদেরকে অনেক সহজ করে তুললো। সরাসরি বলা না হলেও দুজনেই বুঝল তাদের ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অদ্রি নিউমার্কেটে গিয়েছে কিছু দরকারি বই কিনতে। বই দেখতে দেখতে খেয়াল করলো একটি ছেলে তাকে লক্ষ্য করছে। চোখাচোখি হতেই এগিয়ে এলো ছেলেটি, 'কেমন আছেন'?
অদ্রি ছেলেটিকে কোথায় দেখেছে মনে করতে পারলোনা। লজ্জিতভাবে বললো, 'ভালো।'
ছেলেটি নিজে থেকেই বললো, 'আপনি কি আমায় চিনতে পেরেছেন ? আমি মৃদুর বন্ধু, আমার নাম রাজীব।'
'ও হ্যা আপনার সংগে বেশ আগে একবার পরিচয় হয়েছিল। মৃদুর বন্ধু মুফতির বন্ধু আপনি। সেজন্যেই খুব পরিচিত লাগছিল কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না।'
ছেলেটির চাউনিতে অদ্রির মনে হলো সে অদ্রিকে তেমন পছন্দ করছেনা। ব্যাপারটা কি ? দেখবে নাকি একটু টোকা দিয়ে ?
সে বললো, 'আপনাদেরকে এখন গ্রু পে দেখিনা তেমন' ?

ছেলেটি মুখ শক্ত করে রইল কিছু বল্‌লোনা।
অদ্রি নিজে নিজেই আবার বল্‌লো আপনাদের গ্র[] পটা বেশ মজার মৃদুর কাছে অনেক গল্প শুনি। আপনারা ওকে কালি বলেন.....
আমরা না শুধু মুফতি।
ও, মৃদু বলেছিল ও বেশী ফর্সা বলে বন্ধুরা ওকে কালি বলে ডাকে।
'তা হবে। মুফতিওতো এখন 'বন্ধুরা' এর মধ্যেই পড়ে গিয়েছে। আপনি ভাই 'কামিয়াব' লোক, আপনার সাহচর্য পেয়ে ছ'মাসের মধ্যেই মৃদু এত বছরে যা বোঝেনি তাই বুঝতে পেরেছে - সে বুঝে গিয়েছে মুফতি শুধুই তার বন্ধু ছিল।.... 'আচ্ছা আসি'। হনহন করে চলে গেল ছেলেটি।
সন্দেহের যে সাপটা অদ্রির বুকে কিলবিলিয়ে উঠেছিল, তাই যেন এবার ফনা তুলে ছোবল মারতে লাগলো। কাজ শেষ না করেই সে ফিরে এলো বাসায়।
বসে বসে সে মৃদুর সাথে পরিচয় থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত পু[] খানুপু[] খভাবে বিচার করতে লাগলো। তার শুধু মনে হতে লাগলো বড্ড তাড়াহুরো হয়ে গেছে। যদিও মৃদুর ভূমিকাই বেশী ছিল তবু সে কেন চোখ কান খোলা রাখলোনা, কেন একই ভূল আবার করলো ?
সে নিজেই নিজেকে বল্‌লো, 'অদ্রি আবার একই ঘটনা ঘটছে। লুকাসের গ্ল্যামার যেভাবে লুবিনকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তোমার কাছ থেকে, তেমনি মানুষ তুমি নও তোমার গ্ল্যামারই মৃদুকে ছিনিয়ে এনেছে তোমার কাছে।' গুম হয়ে বসে রইল ও।
তিনদিনের মাথায় মৃদুর ফোন 'কি মরে টরে গেলে নাকি কোন খোঁজ নেই।'
'কেন' ?
'কেন মানে' ?
'কেন খোঁজ করছিলে জানতে চাইছি'।
মৃদু ধমকে উঠল,'এভাবে কথা বলছো কেন ? শোন, অফিসের পরে ওখানে চলে এসো' ।
'আজ একটু ব্যাস্ত থাকব'।
'ও কে। তাহলে কাল একই সময় একই জায়গায়, জরুরী' বলে অদ্রিকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন রেখে দিলো।
রাগে অদ্রির গা রী রী করতে লাগল। সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে যাবেনা। আর কোন কথার দরকার নেই। একটু পরেই সে সিদ্ধান্ত পাল্টালো। না, সে যাবে। বরং যা লুবিনকে বলা হয়নি তাই বলবে মৃদুকে। এই প্রচন্ড স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে অবশ্যই কিছু বলা দরকার।
সে দুদিন ধরে প্রস্তুতি নিতে লাগলো কিভাবে উত্তেজিত না হয়ে নিজের আবেগকে লুকিয়ে কৌশলে মৃদুর মুখ থেকে কথা বের করে আক্রমন করবে।

আজ মৃদুর সংগে দেখা হবে। সকাল থেকেই অদ্রির অস্থির লাগছে। রাতে ঘুম হয়নি। মনে হচ্ছে পেট ফুলে আছে। নাস্তাও খেতে পারলোনা ঠিকমতো। একবার ভাবলো অফিসে যাবেনা। তারপর আবার সিদ্ধান্ত পাল্টে অ্যান্টাসিড খেলো। নিজে নিজেই বললো, নাহ্ একটু অ্যাসিডিটি হয়েছে, একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।
কিন্তু কিছুই ঠিক হলোনা। অফিসের কাজেও মন বসাতে পারছেনা। মনে হচ্ছে অ্যাসিডিটি আরও বেড়ে গিয়েছে। অদ্রি কখনও সমস্যার মুখোমুখি দাড়ায়নি বরং এড়িয়ে গেছে, কখনও কখনও ভুগেছে। তবু সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সমস্যা মোকাবেলা করার ধৈর্য হয়নি, হয়তো সাহসও। তাই আজকের এই মুকোমুখি মোকাবেলার সিদ্ধান্তে সে বিপন্ন বোধ করতে লাগলো। ছটফট করতে করতে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সে পৌছে গেল।
বসে বসে অপেক্ষা করতে করতে সে হঠাৎ-ই উপলব্ধি করলো না বিচ্ছেদের জন্যে নয়, সে অপেক্ষা করছে মিলনের। বুনে চলেছে মৃদুকে ঘিরে আশা-আকা[] খার মিষ্টি স্বপ্ন..... মৃদু আসবে.....হাসবে.....অথবা

অন্য কিছু.....হয়তো কোন সারপ্রাইজ। আজ যেনো স্পষ্টভাবে অনুভব করলো মৃদুর প্রতি তার নিবিড় ভালবাসা। একদিন যা তার কাছে শুধু একটি সিদ্ধান্ত ছিল, আজ সেই সিদ্ধান্তের প্রতি গভীর মমতা আর দায়িত্ব অনুভব করলো সে। আজ নিজেকেই প্রশ্ন করলো, 'আমি কি খুবই বাড়াবাড়ি করছি না ? পছন্দমত সংগী নির্বাচনের অধিকার সবারই আছে বরং নোংরামি করেছি আমি। আমি কেন গোয়েন্দাগিরি করতে গেলাম ?'

তার হাসি পেলো। মেয়েরাতো যুগ যুগ ধরেই বীরভোগ্যা। অতীতের পুরুষরা বীরত্বের প্রমান দিয়ে আরাদ্ধ মেয়েটিকে জিতে নিতো। পুরুষতান্ত্রিক এ বিশব থেকে সেই মানসিকতা এখনো পুরোপুরিতো উঠে যায়নি। সম্ভবত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখনও বেশীরভাগ মেয়ের মধ্যে সেই মানসিকতা কাজ করে । তাই একদিন লুবিনের জন্য সে যে কষ্ট পেয়েছিল আজ মুফতি সেই একই কষ্ট পাচ্ছে। আবার এভাবেই একদিন সফল মুফতির কাছে এগিয়ে আসবে অন্যজন। পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজের উচ্চকা[] খী মেয়েরা এভাবেই যোগ্যতম পুরুষ বেছে নেয় হয়তো। হয়তো এখনও তারা নিজে যোগ্যতা অর্জন করার চাইতে যোগ্যতম কারও সাহায্য নিতে, কারও উপর নির্ভর করতেই বেশী পছন্দ করে অথবা করতে বাধ্য হয়।
যদিও এভাবেই শুরু হয় হেরে যাওয়া। কিন্তু সেজন্যে ওদেরকে কি খুব দোষ দেয়া যায় ? সাফল্যের স্বপ্ন দেখার, নিজেকে তৈরী করার, নিজের পছন্দের রাস্তায় স্বাধীনভাবে এগুনোর কতটুকু সুযোগ মেয়েরা পায় এই দেশে? আর শুধু বাংলাদেশেই কেন সারা বিশেবই কি ওরা এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে না ? লুবিনও কি হয়নি? ওরতো যোগ্যতার কোন অভাব ছিলো না তবু লুকাসের কাছে ধর্ণা না দিলে হয়তো সব পরিশ্রম বৃথা যেতো।
অদ্রি বিভিন্ন যুক্তি তর্কের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে কিন্তু লুবিন বা মৃদুকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে না আগের মতো। বরং মনে হচ্ছে, সে বা মুফতি যে একই কষ্ট পাচ্ছে তার কারণ তাদের মানসিকতা। অবচেতনে হলেও লুবিন বা মৃদুকে একজন সতন্ত্র ব্যাক্তি হিসেবে মূল্যায়ন না করে বরং নিজের আকা[] খা চাপিয়ে দেয়ার প্রবনতা তাদের মধ্যে কাজ করেছে বেশী।
মনে মনে বলে সরি লুবিন তোমার সংগে বন্ধুত্ব নষ্ট করার জন্য ক্ষমা কোরো আমাকে।

দুপ্‌দাপ্‌ পা ফেলে মৃদু আসছে। অদ্রি মনে মনে তার কাছেও ক্ষমা চায়। তারপর এগিয়ে যায় হাসিমুখে ।

# বিবমিষার গল্প

বি.এ পাশ করার পর থেকেই চাকরী খুঁজতে শুরু করেছি। পাশাপাশি এম. এ ভর্তি হয়েছি। উদ্দেশ্য চাকরী হয়ে গেলে ভালই নইলে ফোকটে এম. এ টা অন্তত হবে। তাছাড়া নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ দেখতে মেয়ের বিয়ে হওয়া তো আর অত সহয নয়। কিন্তু মর্যাদা জ্ঞানটাও টনটনে। কাজেই কেউ জিজ্ঞেস করলে চাকরী খুঁজছি বলার চেয়ে এম. এ পড়ছি বলতে ভাল লাগে। ব্যাস কষ্টে সৃষ্টে ভর্তি হয়ে গেলাম।

তবে আশা ছিল ছোটখাট চাকরী একটা হয়ে যাবে শিগগিরই। কিছু কিছু চাকরী করা প্রতিবেশী বান্ধবীর বিদ্যার বহর দেখে বলা যায় খানিকটা অহংকারও ছিল যে, রেজাল্ট আহামরি না হলেও পেটে সলিড বিদ্যা কিছু আছে। অন্তত চোথা চালিয়ে পাশ দেইনি।

চাকরী খোঁজার প্রথম পর্বেই অবশ্য সেই ভুল ভাঙতে শুরু করলো। বিভিন্নভাবে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে, 'মনপসন্দ' বায়োডাটা বানিয়ে পোষ্ট বক্সে ছাড়ি। কিন্তু বেশীরভাগেরই উত্তর আসেনা। যাও দু' একটার আসে, ইন্টারভিউর সময় অদ্ভূত সব প্রশ্ন আর শর্ত।

যেমন আমার চাকরীর দরকারটা কী ? আমার কি মনে হয় না একটা মেয়ের চাকরীর চে' একটা ছেলের চাকরী পাওয়া বেশি দরকার ? একটা ছেলে চাকরী পেলে একটা মেয়ে উদ্ধার হয়। কিন্তু একটা মেয়ে তো আর বেকার ছেলে বিয়ে করে না। কাজেই মেয়েদেরই সমস্যা বেশি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি যখন ভাবছি এই সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে এরা এ পর্যায়ে কিভাবে এসেছে তখনই আমাকে হতভম্ব করে শর্তারোপঃ অফিসকে আপন ভাবতে হবে। প্রয়োজনে চা বানানো এবং মেহ্মানদের হাতে পৌঁছে দেয়া। কদিন পর পর ছুটি চাওয়া যাবেনা, প্রয়োজনে বন্ধের দিনও কাজ করতে হবে...না না ওভারটাইম কি! আমি কি শ্রমিক, ন'টা-পাঁচটা অফিসটাইম হলেও পাঁচটা বাজলেই অফিস ত্যাগ করা যাবে না। সাতটা আটটা বাজতে পারে।

প্রথম প্রথম বিনীতভাবে ট্রান্সপোর্টের কথা জিজ্ঞেস করতাম। সবখানেই এক উত্তর ট্রান্সপোর্ট নেই। আরও অনেক অকথিত শর্তই থাকে, যা অনুভূত হয়। যা এই দেশের সামাজিক পরস্থিতিতে একটি মেয়ের জন্য পালন করা কঠিন। অসম্ভবই বলা যায়। তবু শেষ পর্যন্ত আমি হ্যাঁ বোধক জবাব দিয়ে যাই। আগে তো চাকরী হোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই আর হয় না। পরে মনে হতো বোধহয় প্রশ্ন করায় পিছিয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত নিলাম এখন থেকে প্রশ্ন করবো না আর। কিন্তু তারপরও চাকরী হয় না আমার। ঘুরতে ঘুরতে আমি বিভিন্নরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকি। এরমধ্যে বাড়তি কিছু যোগ্যতাও অর্জন করি। একটা ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল টাইপ জানি কি না। সে চাকরীটা হয়নি। আফসোস হলো টাইপ জানলে হয়তো ব্যর্থ হতাম না।

শুরু করলাম টাইপ শেখার সাধনা। আমার এক মামার একটা ভাঙাচোরা টাইপ-রাইটার আছে। প্রতিদিন অনেকটা হেঁটে আমি সেখানে যাই এবং একটু একটু প্র্যাকটিস করি। তবে অনতিবিলম্বেই মামী বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মামা বাসায় না থাকলেই তিনি সে সময় তালা মেরে বেড়াতে চলে যান।

একদিন মামা বললেন, 'এখন টাইপ শিখে কি হবে। এটা হচ্ছে কম্পিউটারের যুগ। শিখতে পারলে সহযেই চাকরি পাবি'। মামাই বাতলে দিলেন মহিলা অধিদপ্তরের অধীনে বিনে পয়সায় কম্পিউটার শেখার রাস্তা। একসময় আদা-জল খেয়ে তাও করলাম। তবু চাকরী হয় না।

চাকরী ক্ষেত্রে মামার প্রভাবের কথা চালু আছে। আমার তেমন কোন মামা চাচা নেই। তবে জানলাম এখন নাকি রাজনৈতিক ভাইয়েরা খুবই পোটেনশিয়াল। কিন্তু আমার বাপ-ভাইয়েরা নিতান্তই ছাপোষা....মুরুব্বীদের আদেশ মান্য করে রাজনীতি থেকে একশত হাত দুরত্ব বজায় রেখে লেখাপড়া শেষ করেছে। কাজেই আমার রাজনৈতিক ভাই তো 'দূর-অস্ত' পাতানোর সোর্স পর্যন্ত নেই।

তবু আমি মরীয়া হলে ঝুলে পড়লাম। বিজ্ঞাপন বাছবিচার করি না, মাঝে মাঝে এমনিতেই বিভিন্ন অফিসে ঢুকে যাই..... খোঁজ নেই লোক লাগবে কি না..... 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই' আর কী।

আর এভাবেই একদিন বিড়ালের ভাগ্যেও শিঁকে ছিড়লো। নাহ্ অফিসটা মোটেই পছন্দসই নয়। রাজনৈতিক ভাইওয়ালা বোনেরা রাজী হবে না এখানে কাজ করতে। কিন্তু আমাকে যখন অফিস অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে জয়েন করতে বললো, আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। ভিক্ষার চাল কাড়া না আকাড়া দেখতে নেই।

প্রথমদিন অফিসে ঢুকেই বিশাল ধাক্কা খেলাম। আমাকে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেয়া হয়নি। বলা হয়েছিল এক তারিখে অফিসে চলে আসতে তখনই দেবে। যেহেতু আমার হাতে কোন কাগজপত্র নেই, তাই জনে জনে আমার পরিচয়সহ ইত্যাদি ইত্যাদি বিবৃত করতে হলো। আর মেয়ে দেখলেই বেশিরভাগ পুরুষের যা হয়, প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় উত্তর দিতে দিতেই দফা রফা।
অবশেষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো বসের ঘরে। কিন্তু সেখানে ঢুকেই আরেক ধাক্কা। ইন্টারভিউ যিনি নিয়েছেন ইনি তিনি নন। আমারই বয়সী এমন কি ছোটও হতে পারে নন্দদুলাল ধরণের এক ছেলে বসে আছে। আমি একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই সালাম দিলাম।
অতঃপর 'বসো'।
বসবো কী আমি 'থ' খেয়ে গেলাম। মানুষ কি টাকার সাথে সাথে প্রবীণতাও অর্জন করে ! নইলে এই ছোকরা অনুমতি নেয়ার সামান্য সৌজন্য না দেখিয়ে আমাকে তুমি বলে কী করে !
আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম লোকটা যে কথা বলছে তার মধ্যে ন[] ণ্যতম সম্মানবোধ নেই আছে প্রকট তাচ্ছিল্য। আমার মর্যাদাবোধ আমাকে তীব্র কটাক্ষ করতে লাগলো। ইচ্ছে করলো উঠে দাঁড়াই। কিন্তু আমি বসেই রইলাম।
মনে পড়লো এতদিনের চেষ্টা, হন্যে হয়ে ঘোরা.... না না চলে যাওয়া চলবে না। সহ্য করতে হবে, 'যে সহে সে রহে।' আমার এমনো মনে হলো যে আমিই বেশি স্পর্শকাতর। আমার বন্ধু-বান্ধবরা তো আমাকে আঁতেলই বলে পড়াশুনার অভ্যাসের জন্য। না মেয়েদের বিশেষত গরীবের মেয়ের হয়তো পড়ালেখার নেশা থাকতে নেই। তাতে বোধগুলো বেশি সজাগ হয়ে যায়।
লোকটা হড়বড় করেই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একজনকে ডেকে বললো,'ওকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দাও।'
বেরিয়ে এসে ছেলেটিকে আমার ইন্টারভিউ যিনি নিয়েছিলেন তার কথা জিজ্ঞেস করলাম। জানলাম তিনি বিদেশে গেছেন। এইটি তাঁর শালা, 'ছোট বস'। আমি মনে মনে বললাম,'শালাই বটে, আমারও ইচ্ছে করছে বলতে "শা-লা"।
সারাদিন এটা সেটা টুকটাক কাজ করতে করতে অফিস ছুটি হয়ে গেল, নিয়োগপত্র পেলাম না। একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করি। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম স্টাফরা এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবে না। যেতে হবে ঐ শালার কাছেই। কাজেই ঠিক করলাম আরও দুটো দিন সবুর করি...'সবুরে মেওয়া ফলে'।
প্রতি দিনই অফিসে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। যদিও একঘেয়ে কাজ, কিন্তু মানুষের বিচিত্রতা আমাকে চমৎকৃত করে। বড় বস্ এখনো বিদেশে। কাজেই শালাই সর্বময় কর্তা। সে প্রতিনিয়ত এ কাজে সে কাজে আমাকে ডেকে পাঠায়। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে যখন কথা বলে তার একটা কথাও আমার কানে ঢোকে না। মস্তিস্ক বোধহয় তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। আর তীব্র অস্বস্তিতে কুঁকড়ে থাকি আমি। যেনো এইমাত্র 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' হয়েছে।
একদিন কিছু নোট নিচ্ছি। সে ভুল শোধরণোর ভাব করে আঙুল চালিয়ে ছুঁয়ে দিলো। আমি স্[] ষ্ট বুঝতে পারলাম এটা ইচ্ছাকৃত। লেখা থেকে চোখ তুলে দেখি লালসায় বিকৃত মুখ। ইচ্ছে করলো কাগজটা মুখের উপর ছুড়ে মারি।
কিন্তু আমি কিছুই করি না। মনে হয় এতটা আদিখ্যেতা মানায় না আমাকে। ছোট ভাইবোনগুলোর চোখে যে স্বপ্ন আমি বুনেছি, নিবিড় অবসরে যে স্বপ্নে আমি ব্যাকুল হই তা অবশ্যই আমাকে সফল করতে হবে।
কাজেই একদিন সে যখন আমি রুমে ঢুকার পরমুহূর্তেই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,'এরোপ্লেন আর রানওয়ের কৌতুকটা জানো ?'
আমি না জেনেও তারাতারি বললাম, 'জ্বী জানি'।

সে খানিকটা আশাহত হয়ে পরমুহূর্তেই বললো,' কথাটা কেন জিজ্ঞাসা করলাম জানো ?' তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললো,' বুঝতে পারো নাই তাই না ? তোমার লকেটটা দেখে মনে পড়লো। এইটা অবশ্য এরোপ্লেন না।' বলে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যে আমার ভয় হতে লাগল সে এখন এই সাধারণ লকেটটা হাতে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে এটা আশলে কী।

বুঝলাম লকেটটা হলো কুচ্ছিৎ একটা কৌতুক শোনানোর ছুতা। আমি দরজার কাছে খানিকটা সরে এসে জিজ্ঞেস করলাম,'স্যার যাবো ?'

তবু সে হতোদ্যম না হয়ে বললো,'চাইনীজ খাবা ?'

রাগে আমার কান্না পেতে লাগলো। মানুষ ঝগড়া করে, মারামারি করে কিন্তু সেটাও বোধহয় এত কদাকার নয় যত এই হাসিমুখ।

তবু আমি হাসলাম। গেঁয়ো একটা ভঙ্গী করে বললাম,'স্যার এগুলি আমি খেতে পারি না।'

অভিনয়টা সম্ভবত নিখুঁত হয়েছিল। সে বিশবাস করলো আমি এতোটাই গেঁয়ো। বেশ তৃপ্তির একটা হাসি তার সারামুখে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর বললো,'অসুবিধা নাই চাইনীজ পছন্দ না হইলে ইন্ডিয়ান ফুড খাবা।'

এবার আমাকে আরেকটা অজুহাত বের করতে হলো। বললাম,'স্যার আমার মা খুব অসুস্থ কাল থেকে। বাসায় বলে এসেছি অফিস থেকে ফিরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

তবু শালা ছাড়ে না। বললো,'এখন যাই চলো। ঐখান থেকে বাসায় পৌঁছে দিব। কাজ কর্মতো তেমন নাই। যাও আজকে তোমার ছুটি।'

আমার এত ক্লান্ত লাগছিল! ইচ্ছে করছিল পেপার ওয়েটটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারি কপাল বরাবর..... নাহ্ যে সহে সে রহে। কাজেই মুখটা করুণ করে বললাম,'স্যার মার শরীরটা খুব খারাপ। আমার মনটা একদম ভালো নেই। অন্য একদিন হবে'।

বেরিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলাম। আরেকটা চাকরীর চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু করবো কখন। সপ্তাহে ছয়দিন ন'টা-পাঁচটা চাকরী। মাত্র পনের দিন হয়েছে এ চাকরিতে। কাজেই ছুটি ছাটাও পাওয়া যাবে না। আর ছুটি নিয়ে চাকরী খুঁজে চাকরী পাওয়ার চিন্তাও হাস্যকর। ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব তাও কি হয় ?

এ পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও পেলাম না। শালাকে একদিন তারল্যের সুযোগে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু ব্যাটা 'জাতে মাতাল তালে ঠিক'। সংগে সংগে বিরক্তি দেখিয়ে বললো,'তুমি কাজ শিখ না। বেতন ঠিকঠাক মতো পাইলেই তো হয়। বস্ আসুক, কাজকর্ম দেখায়ে সন্তুষ্ট করো। আমরা অথরাইজ না বুঝলা ?'

জানলাম বস এ মাসের শেষের দিকেই আসবেন। কাজেই এ ক'দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষাই করি। ততদিনে হয়তো পরিস্থিতি বদলাতে পারে। আমার আশাবাদী মন এমনও ভাবলো যে, আমাকে হয়তো বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে, আমি কতটুকু উপযুক্ত তা বোঝার জন্য।

আমার কোমর-ভাঙা কলিগরাও প্রায়ই মজার মজার অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। দেখলাম অনেকদিন ধরে একই সংগে কাজ করলেও এরা কেউ কারও বন্ধু না। আড়ালে একজন আরেকজনের পেছনে লেগেই আছে। আর বিপদে নাকি বন্ধুর পরিচয়। কিন্তু বিপদে পড়লে অর্থ্যাৎ কোন ভুল হলে এরা কোনোভাবেই তার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করতে চায় না। ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকে অন্যের ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপিয়ে দেয়ার । যদিও নিজের টেবিলে সারাক্ষণই রাজা উজির মারছে কিন্তু 'শালা' খোঁজ করলেই বাথরুমে ছুটোছুটি অবস্থা।

যতই দিন যাচ্ছে ততই বসের সংখ্যা বাড়ছে। বসের যত আত্নীয়, বন্ধু-বান্ধব সবাই 'বিগ বিগ বস'। এরইমাঝে একদিন ঝকঝকে ছেলে এলো একটি। পনের-ষোল হবে হয়তো বয়স। কম-বেশিও হতে পারে। অর্থের লালিমা প্রকৃত বয়স ঢেকে রাখে। আট-নয় বছরের বাচ্চাকে তের-চৌদ্দ মনে হয় আবার চল্লিশ বছরের কাউকে মনে হতে পারে 'বিলো থার্টি'। ছেলেটির পরিচয় বললো না কেউ। তবে আমার কলিগদের 'হীজ এক্সিলেন্সি' মুখভাব দেখেই বুঝে গেলাম।

দেখলাম ছেলেটি বেশ পাকা, নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে বেশ সচেতনও। বাবার অনুপস্থিতিতে মামা দায়িত্ব পালন করলেও তার বোধহয় মনে হয়েছে তারও কিছুটা তদন্ত করা দরকার। সে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন খোঁজ খবর

নিলো। তারপর চাবির গোছাটা লোফালুফি করতে করতে আপনি-তুমির ঝামেলায় না গিয়ে বেশ কায়দা করে জিজ্ঞেস করলো, 'কবে থেকে জয়েন করা হয়েছে ?'
আমি বললাম।
কোন পোষ্টে ?
বললাম।
লেখাপড়া কদ্দুর ?
এ সময় চাবিটা ছিটকে হাত থেকে পড়ে গেল। মিনিটখানেক কাটলো নীরবতায়। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে চাবিটার দিকে বৃদ্ধাঙ্গুল উঁচিয়ে বললো, 'চাবিটা, ঐ যে টেবিলের কাছে।'
আমি তাকালাম। হ্যাঁ, আমার টেবিলের কাছেই বটে। দুজনের মাঝামাঝি যদিও তবু আমার টেবিলের কাছেই খানিকটা। না, আমি স্বভাবসুলভ 'বেয়াদপ' উচ্চারন করিনি, চাবিটাই তুলে দিয়েছি বরং।
মনে হলো ইচ্ছে করেই ফেলা হয়েছে ওটা। একটা এক্সপেরিমেন্ট হলো। এরা হয়তো এভাবেই কোমড় ভাঙতে শুরু করে।
তারপর একদিন সত্যিকারের বসও আসেন। ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন অফিস কেমন লাগছে। খোসগল্পও করেন কিছুক্ষণ। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই ডেকে এটা সেটা গল্প করেন। সপ্তাহখানেক যেতে আমি আবার এপয়েন্টমেন্ট লেটারের কথা বলি। উনি হেসে বলেন,'হবে হবে।'
অফিসের জন্য কিছু ফার্নিচার কেনা হবে। আমাকে দিলেন ক্যাটালগ দেখে লিষ্ট আর হিসাব করার জন্য। সব করার পর অর্ডার প্লেস করার আগে হঠাৎই বললেন,'চলো সামনাসামনিই দেখে আসি।'
গাড়িতে বসে উনি বিভিন্ন কথা বলছেন আর আমি জ্বী জ্বী করছি। হঠাৎ তীব্র অস্বস্তিতে গা গুলিয়ে উঠলো। বৃদ্ধের আঙুল সারা পিঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুঁজে ফিরছে অলিগলি।
আমি চকিতে তাকালাম। একদম স্বাভাবিক হাসি হাসি মুখ! কি যেন বলছেও কাজের কথা। যেন কিছুই না। হাতের আপেলটি কামড় বসানোর আগে নেড়েচেড়ে দেখে নিচ্ছে। ক্ষমতার এই অশ্লীল ঔদ্ধত্বে আমার সারা গা রী রী করে ওঠে।
পাথর হয়ে বসে আছি, মনে হচ্ছে একটা বিচ্ছু উঠে গেছে গায়ে..... বিচ্ছু আমি খুব ভয় পাই.....ভয় পেলে আমি শব্দ করতে পারি না..... ছোটবেলায় আমাদের বাসায় চোর ঢুকেছিল.....আমি প্রথমেই জেগে গিয়েছিলাম.....হালকা আলোয় দেখছিলাম আমাদের যে সামান্য সম্পদ তার সবই চলে যাচ্ছে চোরের থলিতে.....কিন্তু আমি একটি শব্দও করতে পারিনি.... ।
বিচ্ছুকে ভয়ানক ঘেণ্নাও আমার..... একবার আমার ছোট মামা বিরাট একটা বিচ্ছু কাঁঠিতে নিয়ে আমার সামনে ধরেছিলেন ..... তারপর সারাটা দিন আমি বমি করেছি.....এখনও সেই দৃশ্য মনে হলে আমার বিবমিষা হয়.....
এখনও তীব্র বিবমিষায় আমার সব ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে..... আমি কি বমি করবো বিচ্ছুটার কোলেই..... না না বমি-পেশাব-পায়খানা এগুলো তো আড়ালে করতে হয়। আমি চলন্ত গাড়ীর দরজা ধরে হ্যাঁচকা টান দেই। ড্রাইভার চমকে জোরে ব্রেক করে। আমি ছুটে বেরিয়ে পড়ি একটু আড়ালের খোঁজে।

# হৃদয়ে কারাগার

ঘুম ভেঙেই ইরার মনে হলো ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গেছে তার। যেনো স্বর্গ থেকে একেবারে আছড়ে পড়েছে কঠিন মাটিতে। সে প্রচন্ডভাবে বিশবাস করতে লাগলো, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই তিনি আবার আসবেন। অসম্পুর্ন স্বপ্নটি শেষ হবে।

সে চোখ বন্ধ করে সমস্ত মনযোগ ভালবাসার মানুষটিতে স্থির করে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বরাবরকার মতই ঘুম আর আসছে না। বিচিত্র সব সমস্যা ঘুমের ব্যঘাৎ ঘটিয়েই চলেছে। তার মনে হলো ল্যাম্প পোস্টের আলোটার জন্যেই ঘুম আসছে না। চোখের উপর বালিশটা চেপে ধরলো। আহ্, কোথায় যেন একটা কুকুর চিৎকার করছে । দূর, এই মধ্যরাতে কুকুরের আবার কি সমস্যা হলো। ওর ভয়ংকর রাগ হতে লাগলো কুকুরের উপর।

ইরা এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। নাহ্ ঘুমটা গেলোই। বাথরুমে যাওয়া দরকার। উঠে আলো জ্বাললো সে। ঘরে হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে ..... কুঁড়িগুলো ফুটছে। পঁচিশটি রক্তগোলাপ। আজ সকালে একজন লোক এসে পঁচিশটি কুঁড়ির এ তোড়াটি দিয়ে গেছে, সংগে একটি কার্ডে টাইপ করে শুধু লেখা ''ইরার ২৫তম জন্মদিন শুভ হোক' যা কিনা আজকের দিনটির অশুভ সূচনা করেছে।

নিজের জন্মদিনের ব্যাপারে ইরা খুব আবেগপ্রবন, এ কথা বাসার সবাই জানে। তাই তাদের এই মধ্যবিত্ত পরিবারেও তার জন্মদিনটি স্মরণ করা হয়। ভাইয়া, আপু ছোটোখাটো গিফ্ট দেয় মা ভালমন্দ রান্না করে। কিন্তু গত চব্বিশ বছরে এ রকম অভিনব সকাল আর আসেনি।

সকালে বেল বাজতে দরজা খুলেই দেখে, একটি অপরিচিত ছেলে একঝুড়ি ফুল নিয়ে দাড়িয়ে আছে। ফুলগুলো হাতে নিয়ে আপুর দিকে চোখ পড়তে বিব্রত লাগে তার। আপু মুখ চেপে হাসছে। কিন্তু ভাইয়া আর মার মুখে সন্দেহের ছায়া, বাবার কঠোর মুখে কুটিল ভাঁজ। ভাইয়া তো কৌতুহল দমন করতে না পেরে লোকটিকে জেরা করতে শুরু করলো। লোকটি জানালো, তাকে শুধু দোকান থেকে ফুলগুলো পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবু ভাইয়া সন্তুষ্ট হয় না।

ইরার অস্বস্তি লাগে। ফুলগুলো নিয়ে ভেতরে চলে আসে সে। জানে এখন মা বার বার ঘুরে ঘুরে আসবে। বাবা সরাসরি তার সংগে কিছু বলবেন না কিন্তু মাকে অস্থির করে ফেলবেন। বিতৃষ্ণায় তার চোখে জল আসে। আজ তার বয়স পঁচিশ। একজন মানুষ গড়পড়তা ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বাঁচে। সে যদি স্বাভাবিক দীর্ঘ জীবনও পায়, তাহলেও আর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বাঁচবে - এই ছোট্টজীবনটা কেন সে নিজের মনের মতো করে কাটাতে পারবে না? কেন সবাই মিলে তার জীবনে নাক ডোবাবে ?

ফুলগুলোতে হাত ছোঁয়ায় ও। অদ্ভূত এক শিহরণ আঙুল বেয়ে বেয়ে হাতে, বাহুতে, বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। গলার ভেতরটা ব্যাথা করছে। মনটা কেমন হায় হায় করে উঠলো। ফুলের সংগে কি গানের সম্পর্ক আছে। এখন ওর খুব ইচ্ছে করছে গান শুনতে।

কিন্তু এ বাসায় মাঝরাতে গান শোনা আর ইস্রাফিলের শিঙায় ফুঁ দেয়া সম্ভবত সমার্থক। সুতরাং ঐ চেষ্টায় না গিয়ে সে পা টিপে টিপে ডাইনিং রুমে যায়। পানি খেতে গিয়ে চোখ যায় টেলিফোনটার দিকে। ওটা যেন তার দিকে স্থির তাকিয়ে আছে, আর তাকে ডাকছে।

ইরা টের পায় আবার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে নীরার পাশে শুয়ে পড়ে। পাশের খাটে আপু নিঝুম ঘুমাচ্ছে। আপুটা এমন সহয সরল ভালমানুষ বলেই হয়তো এমন নিবিড় ঘুমাতে পারে। সে কেন আরেকটু সরল হলো না ....মনোযোগ দিয়ে পড়শুনা শেষ করে বিয়ের অপেক্ষা। বেশি হলে স্কুল/কলেজে মাষ্টারি। বায়োডাটার সাথে বায়োডাটার মিল-মোহাব্বত করে অভিভাবকরা বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। তাহলেই তো সবকিছু সুখে শান্তিতে চলতে পারতো।

ইরা শুয়ে শুয়ে স্বপ্নটার কথা ভাবে। এখন তার হাসি পাচ্ছে । এমন অদ্ভূত বিশবাস কেন হলো যে ঘুমালেই আবার তাঁকে দেখতে পাবে। সে দেখছিল, বিশাল একটা মাঠের মত খাটের মধ্যে সে এলোমেলো উপুড় হয়ে

শুয়ে আছে। আর একটা কোমল হাত তার চুল, কপাল, পিঠ আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছে। সমস্ত স্বত্ত্বা দিয়ে সে অনুভব করছিল এ তিনি অবশ্যই তিনি। এতো কোমল শুধু তিনিই হতে পারেন। তিনিই পারেন এতো ভালবাসতে।

গভীর মমতায় ইরার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে। সে বার বার বলতে থাকে আই লাভ ইউ..... লাভ ইউ..... লাভ ইউ.....। আমি জানি ফুলগুলো তুমিই পাঠিয়েছো। ধন্যবাদ, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এই দিনটি মনে রাখার জন্য, ধন্যবাদ আমার প্রিয় ফুলের জন্য, ধন্যবাদ আমাকে এত আনন্দ দেয়ার জন্য। এত আনন্দিত আমি কখনো হইনি আমি। এক জীবনের সবটাই যদি কাটে দুঃখে, তবুও এ আনন্দ শেষ হবেনা। খুব ইচ্ছে করছে একবার তোমার গলার আওয়াজ শুনতে। কথা বলবোনা শুধু একটা 'হ্যালো'।

ইরা উঠে যায় ফোন করতে। কিন্তু রিসিভারটা হাতে নিয়ে বসেই থাকে । তার মনের মধ্যে দবন্দ্ব শুরু হয়েছে। রিসিভারটা হাতে নিলেই মনে হচ্ছে 'এত রাতে ফোন করা কি ঠিক হবে ?' আবার রেখে দিলেই মনে হচ্ছে, 'অসুবিধা কি একবার 'হ্যালো' শুনেই তো রেখে দেব।'

এভাবে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক করে সে ঘরে ফিরে আসে। ফোন করলেই যে তিনি রিসিভ করবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি? হয়তো তার ভালোমানুষ স্ত্রীটি ধরবেন। তখন তো মন আরও খারাপ হবে।

আচ্ছা তাঁর স্ত্রীর কথা ভাবতেই ভালমানুষ শব্দটি জুড়ে গেলো কেন ? তারপর সে নিজের উপরই একটু বিরক্ত হয়। আমি কি জানি তিনি মানুষ হিসাবে আসলে কেমন ! একজন মানুষ ভালো কি মন্দ তা কোন মানদন্ডে নির্ধারিত হয় ? কোন মানুষকেই কি সম্পূর্ন ভালমানুষ বা মন্দমানুষ বলা সম্ভব !

আমি তাহলে কেমন মানুষ ? আমি কি মন্দ মানুষ ? ইরা নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে লাগল 'বল ইরা কি মন্দ মানুষ ? তার পরিচিত কোন মানুষ কি বলবে ইরা মন্দ মানুষ।'

সে এক নজরে তার পঁচিশ বছরের জীবনটায় চোখ বুলালো। নাহ্, একেবারেই সাদামাটা নির্বিরোধী জীবন। কোন উত্থান পতন নেই। মেধাবী ছাত্রী হিসাবে খানিকটা সুনাম ছাড়া আর তেমন কোন প্রাপ্তি নেই। তার মনে পড়ে, ছোটবেলায় তার বান্ধবী দেবযানীকে হারমনিয়াম কিনে দেয়ার পর সেও গান শেখার আবদার করেছিল। তাকে অবশ্য গানের মাষ্টার রেখে দেয়া হয়নি, হুজুর রাখা হয়েছিল। শুদ্ধভাবে আরবী পড়া আর নামাজ শিক্ষার জন্য। সেই বয়সেই বাবা তাকে পরকালের শিক্ষা দিয়েছিলেন, ' ভাল করে নামাজ রোজা কর। কবরে যাওয়া লাগবে না ? নাচ-গান কবরে যাইবে ?'

তারপর একেবারে 'খোকন ভাল ছেলে, পড়ার সময় পড়তে বসে খেলার সময় খেলের' মতো ভালমানুষী জীবন। না তাও ঠিক হলো না। সে তো ছেলে নয়। তার জীবনে খেলার কোন স্থান ছিল না। তার শুধু পড়াশুনা আর পরকালের সঞ্চয়। তার কবিতাটা কেমন হবে-- 'ইরা ভালো মেয়ে, পড়ার সময় পড়তে বসে বাঁচে খেয়ে-পরে ?'

নাহ, গত পঁচিশ বছরের জীবনে একটু আধটু কবিতা লেখা ছাড়া আর কিছুই লুকিয়ে করেনি সে। প্রথমদিকের কবিতাগুলি অবশ্য রাগী ধরনের ছিল। যেমন একটা কবিতা লিখেছিল -

পৃথিবীর পুরুষেরা সাবধান
তোমাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে,
নারী জেনে গেছে ঈশবরের নামে
তোমাদের নিপীড়নের কথা
বুঝে গেছে ধর্মগ্রন্থের নামে প্রবঞ্চনার কথা
তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আর মিথ্যা অহংকারের
সব শ্লোক সব প্রবচন;
সে এখন ব্যাখ্যা করতে পারে
কিন্তু তার সবই কি তুমি পারো
পারো কি মা হতে ?
ধ[] র্ত পুরুষ ধিক্; নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে

যে নির্মম ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছ, হাজার বছর ধরে
তাই হবে তোমাদের মরণ ফাঁদ এবারে।

সম্ভবত তখন 'আঠারো বছর বয়স'। বিভিন্ন পারিবারিক আর সামাজিক বৈষম্যগুলিতে খুব ক্ষোভ জমতো মনে। ইচ্ছে হতো প্রচণ্ড বিদ্রোহ করতে । সে অবশ্য এমনিতে কোন স্পর্ধা বা দুঃসাহস দেখায়নি। তবে এরকম বেশ কিছু কবিতা সে সময়েই লিখেছে। তবে লুকিয়ে। কেউ জানে না এই কীর্তির কথা।
সে আবার নিজেকে প্রশ্ন করে, 'কি ইরা কি মনে হয় তোমার? সেই অবিশবাসের কথা লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ? উচ্চকণ্ঠে বললে ভালমানুষ বলবে না কেউ তাই ? ভালমানুষেরা প্রাণের কথা বলে না, সমাজের শিখিয়ে দেয়া কথা পাখীর মত মুখস্ত করে, তাই না ইরা ?'
ইরা আবার নিজের উপর বিরক্ত হয়। 'আচ্ছা আমি তুলনা করছি কেন ? ইদানীং একটা বিশ্রী অভ্যাস হয়েছে। কারণে অকারনে তুলনায় চলে যাই। আমি কি তবে অপরাধবোধে ভুগছি নাকি হিংসুটে হয়ে যাচ্ছি ?'
ও কাঁদতে থাকে, 'আমি এমন জটিল কেন হয়ে গেলাম ! সবসময় আমি সংকীর্ণতাকে প্রচন্ড ঘৃনা করেছি। আর এখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে জটিলতা তৈরী করি। সাধারণ বিষয় নিয়ে লম্বা বিশ্লেষন করি, দ্বিধায় ভুগি। কেন আমি এত কষ্ট পাচ্ছি ! আমি কি কোন দোষ করেছি ? না করিনি, শুধু ভালবেসেছি, ভালবাসা কি দোষ ...পাপ !
পাপ হলেও কি করার ছিল আমার!..... আমি কি চেষ্টা করিনি ফিরতে ? কিন্তু ভালবাসা থেকে কি ফেরা যায়, ...যায় না। ভালবাসার রাস্তাটা একমুখী; পেছানো যায় না শুধু এগুতে হয়।.....না, ভুল হলো। ভালবাসার আসলে কোন রাস্তা নেই। এ এক গভীর গর্ত। এখানে ভাবনা চিন্তা করে পা ফেলা যায় না, ধপাস করে পড়ে শুধু তলানো। নইলে আমার কেন এমন হলো ? আমি কি কখনো ভেবেছি এমন একজন প্রেমিকের কথা..... স্বপ্নেও কি ভেবেছি ?
রক্ষণশীলতার মধ্যে বড় হলেও এমন তো নয় যে আমি অসুর্য্যম্পশ্যা ছিলাম। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বন্ধুও নিতান্ত কম তো ছিল না। বান্ধবীরা তো ভার্সিটিতে ঢুকেই টপাটপ সংগী বাছতে শুরু করেছিলো আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো বন্ধু-বান্ধব থেকে। অথচ, আমার হয়েছিলো উল্টো, শুধুই বন্ধু বাড়ছিলো।
কতো গল্প যে জানতো ওরা। আর ক-তো খবর, জোঁকস্, হিউমার, বই। অজস্র বই এর ভাণ্ডার ছিলো জাহিদের। পৃথিবী বিখ্যাত সব বই সরবরাহ করে ও আমার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলো বই পড়ায়। এদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা কম তো ছিল না, গল্প করতেও কম ভালো লাগতো না। বরং মেয়েগুলোর চেয়ে বেশীই ভালো লাগতো।
একদিন তো এ নিয়েই লিজা ঝগড়া বাধিয়ে ফেললো। ওর সংগে নিউমার্কেট যাবার কথা ছিলো ক্লাশ সেরেই। কিন্তু ক্লাশ শেষে বের হয়েই রিফাতের সংগে দেখা। ফার্মাসীর ছাত্র রিফাত। কত কিছুই যে জানে সে। আর এতো সুন্দর করে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে উপস্থাপন করতে পারে! যুক্তি যেনো সব সময় তৈরী। একটুও উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় অনবরত তর্ক করতে পারে ঘন্টার পর ঘন্টা। আর আমি হৈ চৈ শুরু করে দিলে হেসে বলতো, 'এতো উত্তেজিত হয়ে যাস কেন ? তাহলে তো কোন দিনই তর্কে জিততে পারবি না।'
সেদিনও কি নিয়ে যেনো তর্ক বাঁধলো। এদিকে লিজা অপেক্ষা করতে করতে রেগেমেগে এসে ধরে নিয়ে গেলো আমাকে। তারপর ঝগড়া করতে লাগলো, 'জানিস সবাই তোকে ছেলে ঘেঁষা মেয়ে বলে ? আর ইমনও তো মাইন্ড করতে পারে।'
আমি অবাক হয়ে তাকাই,'ইমনের সংগেও তো আমার গভীর বন্ধুত্ব। মাইন্ড কেন করবে ?'
'ও ব্যঙ্গ করে বললো এত জ্ঞান অর্জন করছিস। প্রেমিকেরা যে প্রচণ্ড জেলাস হয় জানিস না তুই ?'
বললাম, 'প্রেমতো নয় বন্ধুত্ব এবং খুবই ভালো বন্ধুত্ব। আমি এবং ইমন খুব ভালবন্ধু এবং বাল্যবন্ধু। ওর মুরুব্বীও বলতে পারিস আমাকে। ছেলেবেলা থেকেই সব ব্যাপারে আমার উপর নির্ভর করা ওর অভ্যাস।'

লিজা হাসলো, 'কিন্তু গভীর বন্ধুত্বও কি আসলে প্রেম নয়?'
'প্লিজ সংকীর্ন হোস না। আমরা সেই তিন/চার বছর বয়স থেকে কলোনীতে একই সংগে বড় হয়েছি। এখন যদিও কলোনী ছেড়ে এসেছি কিন্তু বাসা কাছাকাছিই। তাই বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হয়েছে।'
লিজা ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। কথাবার্তা কিছুই বলছে না। ওকে সহয করার জন্য বললাম,'আমাদের পুরোণো গল্প তোকে একটু বলি তাহলে বুঝতে পারবি আমাদের সম্পর্কটা।'
ছোটবেলায় ইমু ছিল রোগাভোগা। আর একমাত্র সন্তান হওয়ায় খালাম্মার ছিল ওর প্রতি অতি মনযোগ এবং ওকে নিয়ে অতিরিক্ত টেনশন।
আমি বয়সে ইমুর এক বছরের বড়। তবু খালাম্মা ইমুকে আমার সংগে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, যেন আমি সারাক্ষণ ওর দেখভাল করতে পারি। তাই ঠিক হয়েছিল আপাতত ওর আমার সংগে স্কুলে যাওয়া আসার অভ্যেসটা হোক। পরে কোন একটা ক্লাশে এক বছর ডিটেইন করালেই হবে। কিন্তু জানিস তো ও কেমন ব্রিলিয়ান্ট। শেষ পর্যন্ত কোন ক্লাশেই ওকে আর দুবছর পড়ানো গেল না।
আমি আবার ছোট থেকেই খুব চটপটে, শক্তপোক্ত ছিলাম। স্কুলে যাওয়ার সময় খালাম্মা আমাকে পই পই করে বলে দিতেন ওকে যেন হাত ধরে রাস্ত পার করে দেই। ও টিফিন খেলো কিনা যেন চেক করি। এভাবে ও পানি খাচ্ছে কিনা, কেউ ওকে মারছে কিনা, পড়ে গিয়ে ব্যাথা পেলো কি না, অন্যদের সংগে মিলে দুষ্টুমি করছে কিনা এসব নিয়ে খবরদারি করতে করতে আমি প্রায় ওর লোকাল গার্জেন হয়ে গিয়েছিলাম।'
'কিন্তু ইমনের দিকটা কি ভেবেছিস কখনো ? ও হয়তো তোকে ভালবাসে। আমরা তো সেরকমই জানি। পরে হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরী হতে পারে।'
'নাহ্, সেখানেও সমস্যা নেই। আচ্ছা তোকে একটা ঘটনা বলি। তার আগে তুই বল্, সিমিন যে ইমুকে পছন্দ করতো তা কি তুই জানতি ?
'হ্যা। কিন্তু তুই জানলি কিভাবে আর কবেই বা জানলি ?'
'যখন জেনেছি দেরী হয়ে গেছে। আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছিলাম ইমু আমার ডিপার্টমেন্ট, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তার সংগে গল্প করতে বসলেই সে কিভাবে যেন আলাপটাকে টেনে ওদিকে নিয়ে যায় আর পরোক্ষে সিমিন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। কিন্তু সিমিনের খবর তো আমার কাছে ততো থাকতো না। কারণ ওর সংগে আমার তেমন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি।'
'হু, ও তোকে এড়িয়ে চলতো। হিংসা করতো বোধহয়।'
'হ্যা, পরে অবশ্য সিমিনও আমাকে বলেছে ইমনের জন্যেই সে আমাকে দেখতে পারতো না। কারণ সে লক্ষ্য করেছিল ইমনের সিমিনের প্রতি বেশ আগ্রহ আছে। কয়েকবার কিছু বলবে বলবে ভাব করে তারপর রক্তাক্ত মুখে চুপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সংগে থাকলে একেবারে গুটিয়ে থাকতো। তাই সিমিনের ধারনা হয়েছিল ইমন আসলে তাকেই পছন্দ করে কিন্তু আমি ভিলেন নটখট বাধাচ্ছি।'
ইমুর ব্যাপারটা অবশ্য আমি বুঝতে পারি। স্বভাবগতভাবেই সে খুব লাজুক আর অর্ন্তমুখী হওয়ায় সামাজিক দক্ষতা বেশ কম। কিন্তু এ ব্যাপারে সে হয়তো আমাকে জড়াতে চায়নি, আমি উত্যক্ত করবো ভেবে। অথবা নিজের কথা নিজেই বলতে চেয়েছিলো।
'এটাই তো স্বাভাবিক তাই না ?'
'ঠিক। কিন্তু ও শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আর ধৈর্য্য হারিয়ে যখন আমাকেই ধরলো তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। সিমিন কে যখন বললাম প্রথমে তো ও আমার কথা বুঝতেই পারেনা। তারও তোর মতোই প্রশ্ন। আর তখনই জানলাম কয়েকদিন আগে ওর এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। এখন চলছে বিয়ের প্রস্তুতি।
আমি তবু বলেছিলাম বিয়েটা ভেঙে দিতে। ওদের দুজনেরই এটা প্রথম পছন্দ। প্রথম ভাললাগায় যে আবেগ থাকে তা কি বাইরে থেকে সম্পর্ক তৈরী হলে ফিরে পাওয়া যায় ?'
অবশ্য ও নিজেও বললো, 'ইমনের প্রতি যে প্রচন্ড ভাললাগা ওর মধ্যে কাজ করেছে, ওর জন্য সে যতটুকু পাগলামি করতে পারতো, ছাড় দিতে পারতো, শভিকের ক্ষেত্রে তো তা হবে না। তাকে ও পছন্দ করেছে

কারন খুঁজে, হিসেব নিকেশ করে ভাল পাত্র হিসাবে। আর সারাজীবনই হয়তো কাটবে সুক্ষ্ন হিসাব নিকাশ আর লেনদেনে। তবু ওর ফেরার উপায় নেই। কারণ এটা ফ্যামিলি-পছন্দ হলেও ওকে কোন চাপ দেয়া হয়নি। ও নিজেই মত দিয়েছে ।

'আমার কি মনে হয় জানিস, এখানেই প্রেম আর বন্ধুত্বের বর্ডার। এই যে ইমুর প্রতি ভাললাগার কারনে আমার প্রতি সিমিনের ইর্ষা হলো এটাই, ভালবাসার প্রাথমিক রূপ। কই আমার তো ওর কথা শুনে কোন ইর্ষা বা কষ্ট হয়নি। আমি আমার আনন্দ বা কষ্টটা ইমুর সংগে শেয়ার করছি। কিন্তু কই আমারতো কখনও নিবিড়ভাবে ওকে ছুঁতে ইচ্ছে করেনি।'

'করতেও তো পারে একসময়। গভীর বন্ধুত্ব থেকে প্রেম হতে পারে না?'

'হতে যেমন পারে নাও হতে পারে। যদি তেমন হয় তাহলে তখন তো আর বন্ধুত্ব বলা যাবে না। তখন প্রেমই বলতে হবে। তখন অনেক অনুভবই হয়তো বদলেও যাবে। তাই বলে এখন জোর করে প্রেম বলবি এটাও তো ঠিক না।'

ইরা আবার বাস্তবে ফিরে আসে। আহ্ কি সুন্দরই যে কাটছিলো দিনগুলি। কখন যে সব এলোমেলো হয়ে গেলো।

'সিমিন তার বরের সংগে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য জোর করে আমাকে তার আন্টির বাসায় নিয়ে গিয়েছিলো। সিমিনের মনের তখন অদ্ভূত অবস্থা। একই সংগে হাড়ানোর বেদনা আর জয়ের উল্লাস আর অন্যদিকে নতুন জীবনের কৌতুহল। এর মধ্যে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গেলাম আমি।

এই অদ্ভূত মানসিক অবস্থায় সিমিন আমাকে আকড়ে ধরলো। ফলে, খুব অল্প সময়েই আমাদের প্রচন্ড বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওর বিয়ে শেষ হয়ে আমেরিকা পাড়ি দেয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণের সংগী হলাম আমি। অবশ্য শুধু সিমিনই যে আকড়ে ধরেছে তাও নয়। আমারও গোপন এক আগ্রহ দানা বাঁধছিল তার সংগী হবার।

সেদিন সিমিনের সাথে ওর আন্টির বাসায় গিয়ে দেখি বিশাল আড্ডা। সিমিন তার খালা খালু এবং আরও অনেকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলো। সিমিনের খালা বেশ ফর্সা গোলগাল। তবে তাঁর সৌন্দর্যের কোথায় যেন একটা বিরক্তিকর ব্যাপার আছে। আমি তাকে প্রথমেই অপছন্দ করে ফেললাম।

তারপর সিমিন বললো এই যে আমার রবিন আঙ্কেল। আমি তাকালাম। সম্ভবত চল্লিশের উপর হবে বয়স। আমি সালাম দিতেই তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমার দিকেই কি ? জানিনা । এমন অদ্ভূত দৃষ্টি আমি জীবনে দেখিনি।

তারপর অনেক গল্প হলো। শভিকের সংগে পরিচয় হলো। ভুঁড়িভোজ হলো। তার মাঝেই কিভাবে যেন গল্পে গল্পে আমরা একেবারে একা হয়ে গেলাম। শুধু তিনি আর আমি, আমি আর তিনি। তাঁর গল্প আমার গল্প, তাঁর মতবাদ আমার মতবাদ, তাঁর অনুভব আমার অনুভব সব এক হয়ে গেল। আমরা যেন শুধু পরস্[] রের জন্যেই কথা বলে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে তার অন্যমনস্ক দৃষ্টি আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে (সতিই কি অন্যমনস্ক ছিল! তাহলে আমি কেন এমন কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম !)।

আমি শুধু সামনের সোফায় অলসভাবে পড়ে থাকা তার ডান হাতটি দেখছি। হাতটা আমায় চুম্বকের মত আকর্ষন করছে। বলছে আমায় তুলে নাও ঠাঁই দাও।

আমি চলে আসার জন্য ছটফট করতে লাগলাম। কিন্তু বসে থাকতে এত ভাল লাগছে, বুকের মধ্যে মিষ্টি একটা কষ্ট মুচড়ে উঠছে। আমার নিঃশবাসে আমি তার গন্ধ পেলাম ..... তার গন্ধ আমার বুকের ভেতর ঢুকে গেল।

অনেক অ-নে-ক পরে আসর ভেঙেছিলো। আমাকে থাকতে বললে কি আমি থেকে যেতাম ? জানিনা, কিন্তু ফিরেছিলাম ফেরা ছাড়া উপায় ছিলনা বলেই। ফিরলাম অদ্ভূত দুটি চোখ আর কোমল একটি হাতের স্মৃতি নিয়ে।

সেদিনই প্রথম স্বপ্ন দেখলাম একটি কোমল হাত আমার খোলা চুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেলো। সেদিনও খুব ইচ্ছে করেছে আবার একটু কথা বলতে। বার বার মনে হয়েছে ফোন করার কথা।

আবার নিজেকেই নিজে বলেছি রাত তিনটা বাজে এসময় ফোন করা যায় না। সেদিনও হৃদয় আর মস্তিস্কের লড়াই চলেছে সারারাত ধরে।
হৃদয় বলেছে 'অসুবিধা কি, একবার তাঁর কথা শুনেইতো রেখে দেবো।'
মস্তিস্ক বলেছে 'কিন্তু তিনিই যে ধরবেন তার নিশ্চয়তা কি ?'
'একবার চেষ্টা করতে তো দোষ নেই ।'
'অন্য কেউ ধরলে মন আরও খারাপ হবে।'
আমার হৃদয় অসম্ভব সব কল্পনা করতে লাগলো আর মস্তিস্ক বলতে লাগলো বাস্তবতার কথা। সে বলতে লাগলো তুমি স্থির হও, শান্তভাবে ভেবে দেখ, এ ভুল এ অন্যায়। তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে বুঝতে পারছোনা এতে তোমার বদনাম হবে ?
তুমিতো সবসময়েই যুক্তি পছন্দ কর এমনকি কোন কোন বিষয়ে তোমার মত ভিন্ন হলেও সমাজের যুক্তি মেনে চলো। তাহলে এখন তুমি এ রকম অযৌক্তিক হচ্ছ কেন। বুঝতে পারছোনা সমাজ কি নোংরা আঙ্গুল তুলবে তোমার দিকে। তুমি বরং ইকবালের সংগে আলাপ কর। ও ভাল ছেলে। উজ্জবল ভবিষ্যত। আর তোমাকে যে কত পছন্দ করে তাতো জানোই। ও তোমাকে অনেক ভালবাসবে। ও যে ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরও নিয়মিত ক্যাম্পাসে আসে তুমি তো জানোই সেটা তোমারই জন্যে।
' হ্যা আমি সবই জানি। কিন্তু কোন সাড়া পাই না। আমার ইচ্ছে করে না ওর কাছে ছুটে যেতে, ওর সংগে সময় কাটাতে।'
তবু ওর কাছেই যাও। সবাই খুশী থাকবে। কেউ ছিঃ ছিঃ বলবেনা। কোন অশান্তি হবে না।
আমি কাঁদতে থাকি। হ্যাঁ, আমার আসলে ইকবালের কাছেই যাওয়া উচিৎ। কালই ওকে ফোন করবো। আর কখনও সিমিনের খালার বাসায় যাবো না, ওর বিয়েতেও না।

পরদিন ঘুম ভেঙেই মনে পড়লো আজ ক্লাশ শেষ করে সিমিনের সংগে কার্ড পছন্দ করতে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যাবো না। কাল সারারাত ভেবে ভেবে ঠিক করেছি আজ ইকবালের সংগে কথা বলবো।
সিমিনকে জানিয়ে দেয়ার জন্য ফোন উঠিয়ে আবার রেখে দিলাম। থাক্ মানা করলে ও আবার হাজারটা প্রশ্ন করবে। তাছাড়া ও ফোন না ধরে যদি তিনি ধরেন। আবার যদি সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। তারচে ও-ই ফোন করে জেনে নিক।
ইকবালের সংগে কথা বলে তৈরী হয়ে নিলাম। বেশ একটু সাজগোজও করলাম। ইকবাল নিশ্চয়ই দেখলেই বুঝতে পারবে। হ্যাঁ আমাকে পালাতেই হবে এ ছাড়া আর পথ নেই।
রিক্সায় উঠেই মনটা একদম বিমুখ হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো আজ আর ক্যাম্পাসে যাব না। সামনে পহেলা বৈশাখ বরং আড়ঙে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু গিফ্ট কিনি। ইকবাল অবশ্য অপেক্ষা করবে। থাক ওকে পরে কিছু একটা বলে দিলেই হবে।
আড়ঙে ঢুকেই একেবারে তাঁর মুখোমুখি। হা ইশবর আমার এত আনন্দ লাগছে কেন ! সারা শরীর ঝন ঝন করছে। শরীরও কি কথা বলে, গান গায় ! মাথাটাইবা এমন হালকা লাগছে কেন ! মনে হচ্ছে আমি যেন দাড়িয়ে নেই, যেন পালক হয়ে উড়ে যাব এক্ষুনি।
সংগে সংগেই কেউ যেনো বলে উঠেছিলো পালাও ইরা। কিন্তু না আমি দাড়িয়েই রইলাম। যে শরীর একটু আগেই পালক হয়ে উড়ে যাচ্ছিলো সে শরীর পালানোর জন্য এক পা-ও উঠলোনা। এমন ভারী আর অবশ লাগছে, মনে হলো জীবনে হাটাই সম্ভব হবে না আর।
হ্যাঁ তারপর তাঁরও চোখ পড়লো। দেখলেন, হাসলেন একটু। আর আমি আমার হৃদয়ে শুনলাম গভীর ডাক। তারপরেও কি ফেরা যায় ? আমি জানি না। আমি পারিনি ফিরতে। তারপর থেকে শুধুই জড়িয়ে যাওয়া গভীর থেকে আরও গভীরে। সিমিনের বিয়ে পর্যন্ত উদ্দাম দিন কেটেছে বিয়ের অজুহাতে। তারপর শুরু

হয়েছে লুকোচুরি আর মিথ্যার আশ্রয় নেয়া। এভাবেই চলছে দিনের পর দিন। একসময় হয়তো মিথ্যার এ আশ্রয়টুকুও থাকবে না ।'

অদ্ভূত একটা অবসাদে ভরে আছে মন। কি নাম এ সম্পর্কের। বন্ধুত্ব না প্রেম ? না বন্ধুত্ব তো নয়ই। বন্ধুত্বে এতো কষ্ট, এত পাগলামী আর এরকম তীব্র আকর্ষন থাকেনা। বন্ধুত্বের কিছু সীমা আছে তা অতিক্রম করলে সে সম্পর্ককে আর বন্ধুত্ব বলা যায় না।
কিন্তু প্রেমও কি বলা যায়। প্রেম তো একটা গতিশীল সম্পর্ক। যা সমস্ত স্থবিরতা সমস্ত প্রথাকে ভেঙে দেয়। প্রেম কোন মিথ্যাকে প্রশ্রয় না দিয়ে এগিয়ে যায় পরিনতির দিকে। তাহলে ?
'ইরা তুমি জ্ঞানপাপী।'
'কেন ?'
'তুমি বুঝে-শুনে ভুলের দিকে এগিয়ে গেছ। এখন নিজেকে ঘৃণা হচ্ছেনা তোমার ..... প্রচণ্ড ঘৃণা ?'
'না, ঘৃণা কেন হবে ? সমাজের সঠিকের সংগে নিজের সঠিককে মেলাতে পারিনি কিন্তু সমাজই শুধু সঠিক তাও তো নয়। আমি বরং ঘৃণা করি এ সমাজকে। এ সমাজ হৃদয়ের কথা বলে না, শ্[] খলিত করে হৃদয়কে ।'
'তাহলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছো কেন ? সমাজের ভয়েই তো ?'
'না ভয়ে নয়। ভালবাসাকে বাঁচাতে নিয়েছি মিথ্যার আশ্রয় । নইলে ভালবাসাটাই বাঁচতো না যে।'
'তাহলে পারোনি কেন তোমার ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিতে ?'
'অস্বীকারও তো করিনি। আর স্বীকৃতি কার কাছে দিতে হবে ? এই ভণ্ড সমাজের কাছে ? তা আমি কখনোই করবোনা।'
'কিন্তু কখনো ভেবেছো তুমি কি পেলে ? তাঁর তো পরিপূর্ণ জীবন। তাঁকে তো ছাড়তে হয়নি কিছুই। তুমি তার জীবনে স্রেফ 'অপ্শন্যাল্'। ইরা তুমি ভুল মানুষকে ভালবেসেছো।
'ভালবাসা কি শুধুই ঘর------ভাঙা অথবা গড়া ? আমি তো সওদা করতে বসিনি যে কতটুকু দিলাম আর তার বদলে কতটুকু পেলাম তা নিক্তিকে তুলবো। আর যে আমাকে মুগ্ধ করে, আনন্দিত করে আমার প্রতিটি ক্ষণ, যাকে ভালবেসে আমি সুখী হয়েছি, সে কি করে ভুল মানুষ হয় !
'কিন্তু কতক্ষণই বা তুমি তাকে পাও ? বলা ভালো সে তোমাকে দেয় ।'
'তাতেই পূর্ণ আমি। আমার সমস্ত কৌতুহল, আগ্রহ আর নির্ভরতা ধারণ করে সে।'
'কিন্তু ইরা নিষ্ঠুর সমাজ আন্না কারেনিনাকে বাঁচতে দেয়নি, বাঁচতে দেয়নি অ্যামাকেও। সমাজকে ভণ্ড বলছো কিন্তু এর কাছেই তো ফিরতে হবে বার বার। তোমার পরিণতি কি চোখে পড়ে না তোমার ?'
'তবু দুঃখ করবো না আর। অনেক অনুতাপ করেছি, অনেক পুড়িয়েছি নিজেকে। এখন আমি শুধু জানি ভালবাসি। সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করি ভালবাসি। ভালবাসার পূর্ণতা কি ?..... কী পূর্ণতা জীবনের?..... শুধু কাগজ-পত্র, সংসার সন্তান পেলেই জীবনে পূর্ণতা আসতো !..... না আমি মানি না ..... আমার সমগ্র সত্ত্বায় আমি প্রতিটি মুহূর্তে ভালবাসাকে আবিস্কার করেছি, অনুভব করেছি আর আপ্লুত হয়েছি গভীর আনন্দে। এক জীবনে এর বেশী চাওয়ার আর কি থাকতে পারে।'
'তুমি কি মাতৃত্বকে অস্বীকার করতে চাও ? অস্বীকার করতে পারো মাতৃত্ব নারীর জীবনে অনেক বড় পাওয়া নয়?'
'অবশ্যই মাতৃত্ব নারীর জীবনে অনেক বড় অনুভব। রবিনের প্রতি প্রচন্ড ভালবাসা আমার মধ্যে জাগিয়েছে মাতৃত্বের আকাঙাখা। ওকে যতই গভীরভাবে ভালবাসছি, ততোই আমার স্বত্ত্বায় বেড়ে উঠছে একটি শিশুর অবয়ব। আমাদের সন্তানের কল্পনা, আমার নিঃসঙ্গ সময়ের সঙ্গী। কিন্তু এ সমাজ যেভাবে মাতৃত্বকে নারীর একমাত্র যোগ্যতা হিসাবে দেখাতে চায় তা আমি মানি না। মাতৃত্ব হয়তো নারীর জন্যে বড় অভিজ্ঞতা কিন্তু যোগ্যতা নয়। সৃজনশীল নারী তার কাজের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকে।'

তবু যেনো অবসাদ কাটেনা, শেষ হয়না হৃদয় আর মস্তিস্কের এ লড়াই। শেষ হয়না বিক্ষিপ্ত ভাবনা। সংস্কারের শিকল প্রতিনিয়তই চিড় ধরাতে চায় প্রতিরোধের দেয়ালে। নিজেকে মনে হয় এক অভিসপ্ত নারী। ভালবাসা তাকে পূর্ণতা দেয়নি। তার জন্য কোন বারতা নিয়ে আসেনি ..... বিশাল শূন্যতাকে বয়ে বেড়ানো আর স্বপ্নের অপেক্ষায় ঘুমানো এই হবে ওর ভবিতব্য।

ইরা উঠে বসে। আজান হচ্ছে। প্রতিদিন এভাবে রাত জেগে শেষ রাতের দিকে ঘুমাতে গেলে সকালে বিছানা ছাড়তে দেরী হয়ে যায়। আজ আর ঘুমাবে না। সে হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। নাহ্ একটা জীবনই তো মানুষের। এটা সে কিভাবে কাটাবে তা সম্পুর্ন তার এখতিয়ার।

# বন্দী

ফজরের আজানের শব্দে রাহেলার ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক ঘুম নয় ঝিমুনির মতো এসেছিল শেষ রাতের দিকে। আজ ছয়দিন ধরে রাবুটার আকাশ পাতাল জ্বর। সারাটা রাত ছটফট করে, সাথে সাথে তারও ঘুম নেই।

গত পাঁচদিন ধরে কাজেও যেতে পারছে না। কাল শেষ রাতের দিকে জ্বরটা একটু কমেছে মেয়েটার। এখন নেতিয়ে পড়ে আছে । মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রাহেলার কান্না পায়। ইচ্ছে করে আরো কিছুক্ষণ বুকে নিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু উপায় নেই। আজ কাজে যেতেই হবে। এ সময় কাজ চলে গেলে খুবই বিপদে পড়বে সে। ঘরে নগদ টাকা নেই একটাও। চারদিকে ধার দেনা। বস্তির মুখে যে কম্পাউন্ডারটা বসে, তার কাছ থেকে অষুধ এনেছে বাঁকীতে। ঘরে চাল, ডাল, তেল, নুন কিচ্ছু নেই। রহিম মিয়ার হাতে পায়ে ধরে যা হোক কিছু সওদাপাতি এনে মেয়েটাকে ফুটিয়ে দিয়ে যেতে হবে কাজে যাওয়ার আগে।

এসব ভাবতে ভাবতে আলসেমি ঝেড়ে দুর্বল শরীরটা টেনে তুলে একটু পানি মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। সব কিছু গুছিয়ে একটু সকাল সকাল যেতে হবে। আজ বেগম সাহেবকে বলে একটু তাড়াতাড়ি চলে আসতে হবে। ক'টা টাকাও চাইতে হবে। যেতে দেরী করলে বেগম সাহেব আর কোন কথাই শুনবেন না।

দরজা খুলেই মিসেস নাসিম ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'এতদিনে আসার সময় হল তোমার ? এতদিন এ বাসায় কাজ করছো, জানো না হঠাৎ কাজ বন্ধ করলে কি অবস্থা হয় ? তুমি ছুটি চাইলে ছুটি দেই না আমি ? হুটহাট সাহায্য চাও, কখনো না করেছি ? অথচ আমার দিকটা একটুও ভাবো না। ঝট করে কাজ বন্ধ করে বসে থাকো। তোমাদের জন্য যতই করি না কেন কোন লাভ নেই।'

একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন আর বেগম সাহেবের উগ্র মূর্তি দেখে রাহেলা একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। একটু ধাতস্থ হয়ে মুখ খুলতে যেতেই তিনি আরও রেগে উঠলেন, 'যাও যাও দশ কথা না বলে কাজ শুরু কর। রান্নাঘরে ধোয়াধুয়ি জমে আছে অনেক, সেগুলি আগে শেষ কর।'

কাজ করতে করতে রাহেলা শুনতে পায় বেগম সাহেব এখনো গজগজ করছেন,'একটু যদি আক্কেল থাকে, কথা নেই বার্তা নেই পাঁচদিন ধরে উধাও। কোন আন্তরিকতা যদি থাকতো। এত যে করি তবু কিছু বললেই হুট করে কাজ ছেড়ে দেবে, কটা টাকা বেশী পেলেই অন্য জায়গায় চলে যাবে।'

কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু করলেন,'মেয়েটার এমন সর্দিজ্বর। অফিস থেকে ছুটি নিলাম অথচ মেয়ে ফেলে আমাকেই সব সামলাতে হচ্ছে।'

এত দুঃখের মধ্যেও রাহেলার হাসি পায়। মনে মনে বলে, 'আপনের তো তবু ছুটি আছে কিন্তু আমি কি করি।' সে কাজ করতে করতে অপেক্ষা করে কখন বেগম সাহেবের মাথা ঠান্ডা হবে। বেগম সাহেব একটু রাগী হলেও মানুষ খারাপ না, দয়ামায়া আছে। রাবুর জন্য প্রায়ই এটা সেটা দেয়। সে ঠিক করলো কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে বেগম সাহেবকে বুঝিয়ে বলে কিছু টাকা আর রাবুর জন্য কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে দুপুর নাগাদ চলে যাবে। মেয়েটাকে দু'মুঠ চাল শুধু ফুটিয়ে দিয়ে এসেছে।

রহিম মিঞা কিছুতেই আর কিছু দিলো না। আজকেই শোধ করে দেবে বলার পরেও বললো, ' আগে পুরানডি শোধ কর, এরপরে আবার নিও। আমি কয় ট্যায়া ব্যবসা করি, এত ধার দিলে আমার চলে ?'

মেয়েটার কথা মনে পড়ে রাহেলার চোখ ভিজে উঠে। বড় ভাল তার মেয়েটা, কত শান্তশিষ্ট। মুখফুটে কখনো কিছু চায় না । অথচ কিছু দিলে কত যে খুশি হয়!

এ বাসার কাজ যেদিন ঠিক হলো, সেদিন রাবু ছিল সাথে। গায়ে কোন জামা ছিল না। কাজের কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর বেগম সাহেব রাবুর নাম জিজ্ঞাস করলেন, রাহেলাকে বললেন কাজ শুরু করতে। । তারপর তার মেয়ে রিমিকে বললেন 'ওকে দুটো বিস্কিট দাও'।

রিমি রাবুরই বয়সী। হয়তো এক দু বছরের বড় হবে। এই একটাই মেয়ে বেগম সাহেবের। সারাদিন একা একা থাকে। বিস্কিট দিয়ে ও রাবুর সাথে গল্প শুরু করলো। একটু পরে মাকে বললো 'মামনি আমার গোলাপী ফ্রকটা তো ছোট হয়ে গেছে ওকে দিয়ে দিই ?'
বেগম সাহেব একটু চুপ করে থেকে বল্লেন,'আচ্ছা' । তারপর গম্ভীর হয়ে বল্লেন, 'তোমার হোম ওয়ার্ক শেষ হয়েছে ?'
রিমি ঝটপট উত্তর দিলো, 'হ্যা-এ অনেক আগে'।
বেগম সাহেব তবু খুশী হতে পারলেন না। বল্লেন 'হোম ওয়ার্ক শেষ হয়েছে ব্যাস ঘুরে বেড়াতে শুরু করলে, এভাবে দিন যাবে ? যাও অংক বইটা নিয়ে বসো।'
রাহেলা রান্না ঘরের কাজ সেরে ঘর মুছতে এসে দেখে মেয়ের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। দরজার পাশের আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে আর হঠাৎ হঠাৎ জোরে ঘুরে উঠছে। ঘুরলে জামার কুঁচিগুলো ফুলে ফুলে ওঠে তাই দেখে মেয়ের কি হাসি!
বেগম সাহেব সেদিন পেট ভরে খাইয়েও দিয়েছিলেন। তবে ফেরার আগে রাহেলাকে ডেকে বাচ্চা সাথে করে আনতে মানাও করেছিলেন। তারপর থেকে রাহেলা আর কোনোদিনই মেয়েকে সাথে করে আনেনি। রাবুটা মাঝে মাঝে আসতে চায়, তবে বায়না ধরে না। হয়তো বুঝে গেছে যে তার আবদার করতে নেই। বয়সের চেয়েও পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে দ্রূত অভিজ্ঞ করে।
রাহেলার আরেকবার চোখ ভিজে উঠলো,' পোড়া কপাইল্যা মাইয়া আমার, নাইলে এমন বাপে মইরা যায়।
কি ভালই না ছিল মানুষটা । লেখাপড়ার দিকে খুব আগ্রহ ছিল। নিজে লেখাপড়া জানতো না তাই সবসময় আফসোস করতো। রাহেলার সাথে বিয়েটাও তো সেজন্যেই হলো। রাহেলা তো দেখতে মোটেই ভালোনা কিন্তু ও পড়তে জানে জানার পরই লোকটা কত আগ্রহ করে তাকে বিয়ে করেছিল। লেখাপড়া না জানলে কি হবে মানুষটার মাথাটা ছিল পরিস্কার। শোলক্ পছন্দ করতো খুব, আর গান বাঁধতো। কোত্থেকে কোত্থেকে শোলকের বই জোগাড় করে এনে রাহেলাকে দিয়ে পড়াতো, আর শুনে শুনে মুখস্ত করতো। মানুষজন ডেকে আসর বসাতো গানের আর শোলক্ ভাঙতে দিতো।
কি সুন্দর কেটেছিলো তিনটা বছর। অভাব ছিল তবু কতো সুখে কেটেছে। মাঝে মাঝে এক-আধবেলার খাবার থাকতো না। তখন লোকটা যে কি কষ্ট পেতো। হয়তো লজ্জাও পেতো। বারবার বলতো 'কি মানুষ হইলাম বউরে না খাবাইয়া রাহি।'
রাহেলা ক্ষুধার কষ্ট ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো। তার জীবনে এরকম নরম পুরুষ মানুষ সে দেখেনি। তার বুক কেঁপে দীর্ঘশবাস বেরিয়ে আসে 'এই ল্যাইগ্যাই বাঁচলো না। পুরুষমানুষ এরুম নরম হইলে বাচে! বুকে বলে দোষ আছিল। ডাক্তার কইছিল বুকে দোষ নিয়া গান করনেই এই অবস্থা।'
দোষ তো ছিলোই। রাহেলা নিজেই বোঝে যে দোষ ছিল। ডাক্তার না বললেও বোঝে। বুকে দোষ না থাকলে পুরুষ মানুষের মন এত নরম হয় -যে মন মেয়েমানুষের জন্য কাঁদে!

বিয়ের আড়াই বছর পর্যন্ত রাহেলার পেটে সন্তান আসেনি। এই নিয়ে সবার কতো চিন্তা কতো কথা। অথচ লোকটা কিন্তু একদিনের তরেও কিছু বলেনি একটু বেজার হয়নি। আবার রাবু যখন পেটে এলো, এই লোকেরই কি আনন্দ তখন। রাহেলা যেন চিনতেই পারেনা মানুষটাকে। এই মানুষটার মধ্যে এত তৃষ্ণা ছিল সন্তানের জন্য!
সারাক্ষণ শুধু সন্তানের কথা ; কিভাবে বড় করবে, লেখাপড়া শেখাবে, কিভাবে আয় আরও বাড়াবে। আরও কতো কী।
রাহেলা তার স্বপ্ন বোনা দেখে ভয় পেতো। একদিন বলেও ফেলেছিল,'যদি মাইয়া অহে'
লোকটা অবাক হয়ে বলেছিলো,'আমি কোনসুম কইলাম পোলা হইব'
রাহেলার মুখে কথা সরেনা। সারাদিন এতো পরিকল্পনা করে, লেখাপড়া করানোর কথা বলে, অথচ.....

লোকটা বুঝতে পেরেছিল তার ভাবনা। বলেছিল, 'পোলা মাইয়া কোন ব্যাপার না বউ, সন্তান হইল গিয়া সন্তান এর কোন তুলনা হয় কও।'
আরও হয়তো অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিলো। কিন্তু বলতে পারেনি। রাহেলার হাত ধরে চুপচাপ বসেছিলো। রাহেলার আবার বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশবাস পড়ে 'বুকে দোষ আছিলো লোকটার'।

মিসেস নাসিম ঘরের ভিতর থেকে ডাক দেন, 'বুয়া.....'
রাহেলা এসে দাঁড়াতেই বললেন,'হাতের কাজ শেষ করে বেশী করে মসলা কর। আজ মেহমান আসবে, তুমিও একবারে খেয়েদেয়ে যেও'।
রাহেলা বলতে চেষ্টা করলো,'আমি খামুনা আফা.....'
কিন্তু তিনি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেশ না খাও নিয়ে যেও। এখন তাড়াতাড়ি কাজে লেগে যাও। আর শো-কেস থেকে ডিনার সেটটা নামিয়ে ধুয়ে মুছে রাখো। দেখো ওটা ময়নাকে ধরতে দিওনা ভেঙে ফেলবে।'
রাহেলা চিন্তায় পড়ে গেল। রিমির জ্বর ; মেয়েটার অসুখ বিসুখে বেগম সাহেব একেবারে অস্থির হয়ে যান। ময়না একা একা তেমন কিছু পারে না। ও না এলে হয়তো বাইরে থেকে এটা সেটা আনাতেন বা অন্য ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এসে যখন পড়েছে আজ তাকেই সব সামলাতে হবে।
সে কি করে এখন ? আজ কি ছুটি মিলবে ? জোর করে যে চলে যাবে সে উপায়ও নেই, কিছু টাকা আজ নিতেই হবে। নইলে মেয়েটাকে আর বাঁচাতে পারবে না। সে মসলা করতে শুরু করলো। কাজে একদম মন বসছেনা। তবু ঠিক করলো কাজগুলি গুছিয়ে দিয়ে বেগম সাহেবকে বুঝিয়ে বলবে।
বেগম সাহেব কি যেন বলছেন, দৌড়ে যায় রাহেলা।
'বুয়া আপেল কেটে আনো তো রিমির জন্য। সেদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে।'
একটু পরেই তিনি আবার ডাকলেন,'বুয়া রিমি আপেল খাচ্ছে না একটু জুস করো তো।'
'বুয়া ফ্রিজে মুরগীর বাচ্চার প্যাকেট আছে নামাও, রিমির জন্য স্যুপ করবো'।
'বুয়া পানি গরম কর রিমির গা স্পঞ্জ করবো।..... দেখি টাওয়েলটা দাও তো।'
'বুয়া ...দৌড়ে একটু বাজারে যাও রিমি আঙ্গুর খেতে চাচ্ছে।'
'বুয়া রান্নার কদ্দুর.....'
এভাবে রিমির যত্ন আর মেহমানদারির ধাক্কায় সকাল আটটার কাঁটা কখন যে গড়িয়ে গড়িয়ে রাত আটটায় পৌঁছেছে রাহেলা টেরই পেলো না। সারাদিনে কিছু খাওয়া হয়নি। একবারও যাওয়ার কথা বলার বা ভাবারও কোন সুযোগ হয়নি। শুধু বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠেছে।
টাকা আর খাবার গুছিয়ে নিয়ে রাহেলা ছুটে বের হয়। আঁধার নেমেছে, যেতে হবে অনেকটা রাস্তা। মেয়েটা কি করছে কে জানে। কাউকে বলেও আসেনি। ভাবতেই পারেনি এত দেরী হবে। আর বললেই কি হতো সারাদিন সবাই যার যার ধান্ধায় থাকে। ওর মেয়ের সেবা কে করবে।

রাবু সকালের রান্নাকরা ফেনভাত খানিকটা খেলো। শুধু ভাত খেতে তার মোটেই ভালো লাগছেনা তাই একটু খেয়েই রেখে দিলো। মা যদি একটু তরকারী নিয়ে আসে তাহলে মজা করে খাওয়া যাবে। কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার শুয়ে পড়লো সে। খুব দুর্বল লাগছে। শুয়ে শুয়ে মায়ের সাথে কথা বলতে লাগলো,' আহ্ মা কোনসোম আইবা তুমি। মা গো মা তাড়াতাড়ি আইয়া পড়'।
মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তবু মায়ের দেখা নেই। রাবুর অস্থির লাগে। মা কেন আসছেনা এখনো ! তার শরীর আবার খারাপ লাগছে..... আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে, পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ, তবু উঠতে ইচ্ছে করছে না।

মা নিশ্চয়ই এখনি চলে আসবে। মা এলেই পানি খাবে, উঠে ভাতও খাবে। ক্ষুধায় মাথা কেমন হালকা হালকা লাগে; ঝিমুনি আসে তার। একটু পরেই চমকে উঠে বলে ‘ও মা আইলা ?’
সব সুনসান। নাহ্ আর পারেনা, আর অপেক্ষা সয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে উঠে দাড়ায়। দরজার কাছেই কলস। কিন্তু এটুকু যেতেই বড় কষ্ট। একটুখানি গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়লো চৌকাঠে সেখান থেকে ছিটকে গড়িয়ে গেল দাওয়ায়। মাথাটা সজোরে ঠুকে গেল কোণে জড়ো করে রাখা ইট পাথরে।

আকাশে লক্ষ অযুত তারা। মাটির কোলে ঘুমাচ্ছে রাবু ---নিবিড় শান্তির ঘুম। মাটি কি গাইছে চাঁদমামা আয় রাবুর কপালে টীপ দিয়ে যা।